ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

৬০ বর্ষ ৪৯ সংখ্যা ।। ১ ভাদ্র, ১৪১৫ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১০) ১৮ আগষ্ট, ২০০৮ ।। Website : www.eswastika.com ।। ১৫ আগষ্ট বিশেষ সংখ্যা।।

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

অনুপ্রবেশকারীদের পুশ-ব্যাক করছে না পশ্চিমবঙ্গ

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। পাসপোর্ট ভিসা নিয়ে এ রাজ্যে এসে গত এক বছরে প্রায় ২৬ হাজার বাংলাদেশি সেদেশে ফিরে যায়নি। তারা কোথায় তাও অজানা রাজ্য পুলিশের। এ রাজ্যে আসার সময় যে ঠিকানায় থাকার কথা বলে বাংলাদেশিরা এসেছিল সেই ঠিকানায় তাদের পাওয়া

স্বরাষ্ট্র সচিব অশোকমোহন চক্রবর্তী

যাচ্ছে না বলে পুলিশ কর্তারা সরকারকে জানিয়েছে। অবৈধভাবে আসা বাংলাদেশির সংখ্যা রাজ্য সরকারের কাছে নেই। কিছু পাসপোর্ট ভিসা নিয়ে এরাজ্যে এসে ফেরত না যাওয়া বাংলাদেশির সংখ্যা যে এত বেড়ে যাচ্ছে তা নিয়ে চিন্তিত রাজ্য। যদিও এসব

(এরপর ২ পাতায়)

পাকপন্থী নেতাদের চাপেই কংগ্রেসের ডিগবাজি

অমরনাথ জমি বিতর্ক জিইয়ে রাখছে কেন্দ্র

গূঢ়পুরুষ ।। সন্দেহ নেই যে পাক মদতেই কাশ্মীরের বুকে আজ অশান্তির আগুন জ্বলছে। প্রকাশ্যে বলা হচ্ছে, কাশ্মীর উপত্যকায় হিন্দুদের ঢুকতে দেওয়া হবে না। অমরনাথ তীর্থযাত্রা বন্ধ করে দেওয়া হবে। কাশ্মীরে মুসলমান জান দেবে, কিন্তু অমরনাথ যাত্রীদের জন্য এক ইঞ্চি জমি দেবে না। এই প্ররোচনাই জম্মুতে হিন্দুদের প্রতিবাদী করেছে,সঙ্ঘবদ্ধকরেছে। কারণ, পাকপন্থী রাজনীতিকদের চাপে নতি স্বীকার করে কাশ্মীর সরকার প্রদত্ত জমি ফেরৎ নিয়ে হিন্দু স্বাভিমানকে আঘাত করেছে।

অমরনাথ যাত্রীদের বিশ্রাম ও অন্যান্য স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কাশ্মীরের গুলাম নবি আজাদের কংগ্রেস সরকার ঘোষণা করেছিল যে অমরনাথ তীর্থক্ষেত্র পরিচালন পর্ষদকে বালতালে প্রায় চল্লিশ হেক্টর সরকারি জমি বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে, এখানেই গড়া হবে অমরনাথ তীর্থযাত্রীদের জন্য প্রয়োজনীয় বিশ্রামাবাস, হাসপাতাল, পাহাড়ে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে দ্রুত শ্রীনগরে নিয়ে যেতে হেলিকপ্টার সার্ভিস ইত্যাদি। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল, বর্তমান অমরনাথ যাত্রার দীর্ঘ পথকে সংক্ষিপ্ত করা। অমরনাথ যাত্রীরা সাধারণভাবে শ্রীনগর থেকে রওনা হয়ে পহেলগাঁও চন্দনও বাড়ি ও শেষনাগ হয়ে অমরনাথ পৌঁছান। এই পথ দীর্ঘ। অন্যপথটি হচ্ছে শোনমার্গ হয়ে বালতাল এবং সেখান থেকে মাত্র ১৬ কিলোমিটার পাহাড়ি পথ পায়ে হেঁটে। তাই ঠিক হয়েছিল যে শেষনাগের পরিবর্তে বালতালকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠুক অমরনাথ যাত্রীদের জন্য স্থায়ী সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থা।

এই সরকারি প্রস্তাবটি যখন অনুমোদনের জন্য কাশ্মীর বিধানসভায় আনা হয় তখন বিনা আপত্তিতেই প্রস্তাবটি পাশ হয়। আজ কাশ্মীরের প্রধান বিরোধী দল পিপ্‌লস ডেমোক্রাটিক পার্টির প্রধান মেহবুবা মুফুতি এবং ন্যাশনাল কনফারেন্স দলের নেতা সাংসদ ওমর আবদুল্লা প্রকাশ্যে বলছেন, কাশ্মীরের মুসলমানরা জান দেবে কিন্তু এক গজ জমিও হিন্দুদের দেবে না। অমরনাথ জমি বিতর্ক শুরু হয় পাকপন্থী উগ্র মুসলিম মৌলবাদি নেতা সৈয়দ আলি শাহ গিলানির নির্দেশে। কাশ্মীরে সরকার গড়তে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল মেহবুবা মুফতির পি ডি পি। উগ্রবাদীদের হুমকিতে ভয় পেয়ে মেহবুবা মুফতির দল সমর্থন তুলে নেয় এবং গুলাম নবি আজাদ সরকারের পতন হয়।

এই সময় কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী আজাদ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মেহবুবা মুফতির নিন্দা করে বলেছিলেন যে পাক উগ্রপন্থীদের খুশি করতেই মুফতি কাশ্মীরে অচল অবস্থার সৃষ্টি করতে চাইছেন। এমন কথাও মুখ্যমন্ত্রী তখন বলেছিলেন, পাক মদতেই অমরনাথ মন্দির বিতর্ক উস্কে দেওয়া হয়েছে। পাকিস্তানের উদ্দেশ্য ধর্মীয় আবেগ সৃষ্টি করে কাশ্মীর উপত্যকাকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করা। কিন্তু দিল্লীর চাপে তিনি বাধ্য হন জমিদানের সরকারি সিদ্ধান্তটি বাতিল করতে।

কাশ্মীর সরকারের এই বেইমানিতে সারা দেশের হিন্দু সমাজ স্তম্ভিত হয়ে যায়। অনেকেরই মনে পড়ে যায় মহাভারতের সেই অমর কাহিনি। যেখানে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে দুর্যোধন সদম্ভে বলেছিল যে পাণ্ডবদের পাঁচটি গ্রাম কেন সূচের ডগায় যেটুকু মাটি উঠে তাও দেব না। পরিণামে কৌরব বংশ ধ্বংস হয়েছিল। হিন্দুর মনে প্রশ্ন উঠেছিল বালতালে জনবসতিহীন অরণ্য পর্বত এলাকায় সরকারি খাসজমিতে অমরনাথ যাত্রীদের জন্য ধর্মশালা-ভোজনের ব্যবস্থা করলে কাশ্মীরের মুসলিমদের আপত্তি কেন? রাজ্য সরকারের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে প্রতি বছর অমরনাথ যাত্রার মরশুমে মুসলিম যাত্রী সহায়করা মাথা পিছু মাসে কমপক্ষে ১২,০০০ টাকা রোজগার করে। আসলে খেটে খাওয়া এইসব মানুষদের কোনও

(এরপর ২ পাতায়)

এক নজরে জম্মু ও কাশ্মীর উপত্যকা

	জম্মু	কাশ্মীর উপত্যকা
এলাকা	২৬,২৯০ বর্গ কিমি	১৫,৯৫০ বর্গ কিমি
জনসংখ্যা	৩০ লক্ষ	২৮ লক্ষ
রাজস্ব আদায়	৭০ শতাংশ	২৫ শতাংশ
বিধানসভা আসন	৩৭	৪৬
লোকসভা আসন	২	৩
বেকার	৬৯.৫ শতাংশ	৩০ শতাংশ

মরিয়া সিমি, তথ্য-প্রমাণ চেপে যাচ্ছে কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। গত ৫ আগষ্ট দিল্লী হাইকোর্টের বিশেষ ট্রাইব্যুনাল কট্টরপন্থী ছাত্র সংগঠন সিমি অর্থাৎ স্টুডেন্ট ইসলামিক মুভমেন্ট অফ ইন্ডিয়া-র উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা খারিজ করে দেন। আদালতের বক্তব্য ছিল নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখার মতো প্রয়োজনীয় তথ্য প্রমাণ ভারত সরকারের পক্ষ থেকে পুলিশ পেশ করতে পারেনি।

প্রকৃত ঘটনা কিন্তু উল্টো কথা বলছে। মহামান্য আদালত ও বিচারপতিদের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা বিশ্বাস সত্ত্বেও মনে হচ্ছে এর পেছনে কিছু অদৃশ্য হাত কাজ করেছে। প্রশ্ন ওঠাটাই স্বাভাবিক যে এতসব তথ্য প্রমাণ সত্ত্বেও পুলিশ তা আদালতে পেশ করেনি কেন? সেটা কি ইচ্ছাকৃত অথবা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এরকম রায় চেয়েছিল বলেই যথেষ্ট তথ্য আদালতে পেশ করেনি?

এই জিজ্ঞাসার সন্ধানে দেখা যেতে পারে, কি কি তথ্য প্রমাণ ছিল এবং এখনও মজুত রয়েছে। যখনই দেশের কোনও এলাকায় বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে তখনই সন্দেহের তীর সিমি-র দিকে গিয়েছে। পুলিশের পক্ষ থেকেই বলা হয়েছে — সিমি পাকিস্তানী গুপ্তচর সংস্থা আই এস আই-র হয়ে খেলছে এবং বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে।

গত দু' বছরে সারা দেশ জুড়ে একের পর এক বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। অনেক নিরীহ মানুষ মারা পড়েছে। কিন্তু অভিযোগের তীর সিমির দিকে ঘুরলেই তারা জানিয়ে দেয় যে, তারা কোনওভাবেই যুক্ত নয়।

দিল্লী হাইকোর্টের বিশেষ ট্রাইব্যুনাল এই ইসলামি গোষ্ঠীটিকে ধোয়া তুলসীপাতা হিসাবে ছাড়পত্র দিলেও বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম ভারতব্যাপী ধ্বংসাত্মক বিস্ফোরণে সিমি-র হাতই খুঁজে পেয়েছে। গত দশবছর ধরে সিমি সংবাদের শিরোনামে বার বার উঠে এসেছে। মুম্বাইয়ে লোকাল ট্রেনে ধারাবাহিক বিস্ফোরণের ঘটনায় ১১ জুলাই ২০০৬ সালে ১৩ জন সিমি কর্মীকে গ্রেপ্তার করে মহারাষ্ট্র পুলিশ।

ওই ঘটনার মাত্র দু'মাস পরে মহারাষ্ট্রেরই বস্ত্রশহর মালেগাঁওয়ে একসঙ্গে চারটি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এখানেও কিন্তু অভিযোগের আঙুল ওঠে সেই সিমি-র দিকেই। এই মুহূর্তে মহারাষ্ট্রের আদালতে ৩৩ জন সিমি কর্মীর বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্র কন্ট্রোল অফ্ অর্গানাইজড ক্রাইম অ্যাক্টে

(এরপর ২ পাতায়)

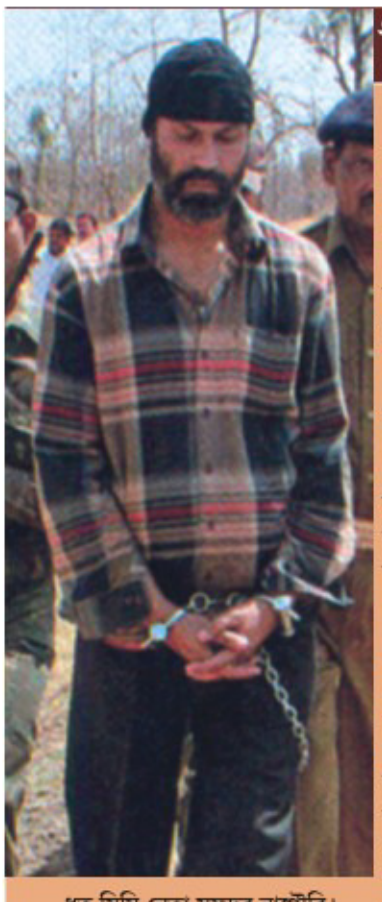

ধৃত সিমি নেতা সফদর নাগৌরি।

সিমি-র সন্ত্রাসের খতিয়ান, গ্রেপ্তারের হিসাব

১৪ মে ২০০৩ — মুম্বাই পুলিশের হাতে ধৃত ৩ জন সিমি ক্যাডার ধৃত।

২৬ মে ২০০৬ — মুম্বাই ২ জন ধৃত।

২১ জুন ২০০৩ — দিল্লীর পোটা আদালত দুজন সিমি কর্মীকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে।

১২ সেপ্টেম্বর ২০০৩ — পশ্চিমবঙ্গ দুজন সিমি ক্যাডার ধৃত।

১১ নভেম্বর ২০০৩ — দিল্লীর এক আদালত রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ সিমি-র কথিত সভাপতি সাহিদ বদর ফালাহ্-কে অভিযুক্ত করে।

১ নভেম্বর ২০০৪ — সিমি কর্মকর্তা মৌলানা নাসিরুদ্দিন হায়দরাবাদে গ্রেপ্তার।

১১ জুলাই ২০০৫ — মুম্বাইতে ৮ জন সিমি ক্যাডার গ্রেপ্তার। ওই একই দিনে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ ফৈজাবাদ থেকে মোট ৬ জনকে গ্রেপ্তার করে।

৬ জুলাই, ২০০৬ — সুপ্রীম কোর্ট সিমি'র উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আবেদন বাতিল করে দেয়।

১৩ জুলাই, ২০০৬ — মুম্বাই পুলিশ প্রায় ২০০ সিমি ক্যাডারকে গ্রেপ্তার করে।

২১ জুলাই ২০০৬ — মুম্বাইতে তিন জন সিমি কর্মী গ্রেপ্তার।

৩০ অক্টোবর, ২০০৬ — মুম্বাইতে নুরুল হুদা নামে এক সিমি কর্মী গ্রেপ্তার।

১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০৭ — সুপ্রীম কোর্ট সিমি-র কাজকর্মকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে বর্ণনা করে।

২৭ মার্চ ২০০৮ — সিমি-র সভাপতি ও নেতা সফদর হুসেন নাগৌরিকে ১২ জন সঙ্গীসহ ইন্দোরে গ্রেপ্তার করা হয়।

৫ আগষ্ট, ২০০৮ — দিল্লী হাইকোর্টের ট্রাইব্যুনাল সিমি-র উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে।

৬ আগষ্ট ২০০৮ — সুপ্রীম কোর্ট দিল্লী হাইকোর্টের টাইব্যুনাল-এর রায় স্থগিত রাখে, অর্থাৎ সিমি নিষিদ্ধ সংগঠন।

সিমির নিষেধাজ্ঞার নেপথ্যে কি বোঝাপড়া ?

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ২২ জুলাই আস্থা ভোটে সমাজবাদী পার্টির কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ সরকারকে সমর্থন এবং সেই সরকারকে বাঁচানোর তাগিদে সমাজবাদী পার্টির সাধারণ সম্পাদক অমর সিং চৌধুরীর ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা সবার জানা। তাঁর প্রয়াস সফল হওয়ার পর গত ৫ আগষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্য প্রমাণের অভাবে দিল্লী হাইকোর্টের বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বিচারক গীতা মিত্তল নিষিদ্ধ মুসলিম ছাত্র সংগঠন 'সিমি'-র উপর থেকে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আদেশ দেন। ওয়াকিবহাল মহলের মতে এই দুই ঘটনার মধ্যে গূঢ় সম্পর্ক রয়েছে। সেই সম্পর্কের সূত্র পাওয়া যাচ্ছে সিমি-র উত্তরপ্রদেশের নেতা সদর ফালাহির এক বক্তব্য থেকে। এখন আর এটা কোনও লুকানো ঘটনা নয় যে, সিমিকে সাচ্চা সংগঠন বলে সমাজবাদী দলের দুই শীর্ষ নেতা অমর সিং ও মুলায়ম দরাজ প্রশংসাসূচক সার্টিফিকেট অতীতে দিয়েছেন। এমনকী সুপ্রীম কোর্ট নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখার পরও দিয়ে চলেছেন। সদর ফালাহি জেল থেকে বের হওয়ার পর তাঁর বিরুদ্ধে দাখিলীকৃত অভিযোগগুলো (আদালত বা প্রশাসন যা দাখিল করেছে) ধুয়ে মুছে সাফ করার জন্য সমাজবাদী দলের সমর্থন নিতে কোনও কুণ্ঠাবোধ করেননি। এই নিয়ে সিমি-র বর্তমান সভাপতি সফদর হুসেন নাগৌরির সঙ্গে তার মত পার্থক্য হয়।

নাগৌরির বক্তব্য ছিল — সিমির তিনটি লক্ষ্য — (১) গুজরাট ও (২) মুম্বাই দাঙ্গার পরিকল্পনাকারীদের শাস্তি দেওয়া এবং (৩) বাবরি কাঠামো ধ্বংসের প্রতিশোধ নেওয়া। এজন্য সিমি কর্মকর্তা শিবলি, হাফিজ, কামারুদ্দিন, ইকরার শেখ, শাহবাজ এর নেতৃত্বে হুবলি ও উজ্জয়িনীর জঙ্গলে এবং মুম্বই-এ সিমি ক্যাডারদের ট্রেনিং চলছে।

কেন্দ্র এইসব তথ্য 'টাটকা প্রমাণ' হিসেবে যোগাড় করে। যার ফলে নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক আগে এগুলিকে পৃষ্ঠভূমি বলে উল্লেখ করেছিল। তখন ট্রাইব্যুনাল তা নিষেধাজ্ঞার সময়সীমা বাড়িয়ে দেওয়ার পক্ষে পর্যাপ্ত নয় বলে নিষেধাজ্ঞাই বাতিল করে দেয়।

৬ আগষ্ট নয়াদিল্লীতে সমাজবাদী পার্টি এক বিবৃতিতে বলে যে, ইসলামি ছাত্র সংগঠনটির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা ঠিক নয়।

দলের শীর্ষনেতা মুলায়ম সিং যাদব আরও এককাঠি এগিয়ে বলেন, সিমিকে নিষিদ্ধ করলে আর এস এস-কেও নিষিদ্ধ করতে হবে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে উত্তরপ্রদেশে চিরাচরিত মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক একসময় কংগ্রেসের একচেটিয়া ছিল। রামজন্মভূমি আন্দোলনের পরপরই তা কংগ্রেস থেকে এস পি এবং বি এস পি-র দিকে চলে যায়। এস পি তাকে আরও সুসংহত করার জন্য সিমি-র প্রতি অযাচিত সমর্থন জাহির করছে।

২০০৭-এ মায়াবতীর উত্থানে ওই মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক এখন মায়াবতীর বহুজন সমাজপার্টির দিকে ঝুঁকে গিয়েছে। কংগ্রেস নেতৃত্বের একটা বড় অংশও মনে করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক বিশেষ ট্রাইব্যুনালের সামনে সিমি'র সম্পর্কে দুর্বল ও তালগোলপাকানো তথ্যপ্রমাণ দাখিল করেছে।

একজন প্রবীণ কংগ্রেস নেতার মতে স্বরাষ্ট্র দপ্তর আরও অনেকটা গুছিয়ে-গাছিয়ে তথ্য প্রমাণ ট্রাইব্যুনালে দাখিল করতে পারত। যেখানে গোয়েন্দা বিভাগই বাঙ্গালোর ও আমেদাবাদের ধারাবাহিক বিস্ফোরণে সিমির দিকেই আঙুল তুলেছে সেখানে স্বরাষ্ট্র দপ্তর এরকম গা-ছাড়া ভাব দেখায় কী করে? পরদিন অর্থাৎ ৬ আগষ্ট দেশের সর্বোচ্চ আদালত ট্রাইব্যুনালের রায়ের উপরে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিয়ে কেন্দ্র সরকারের মুখরক্ষা করেছেন বলা যায়।

টাকা দিয়ে ভোট

সংবাদদাতা।। ১০০ দিনের কাজের লক্ষ লক্ষ টাকা ভোটের স্বার্থে খরচ করার অভিযোগ উঠল বামফ্রন্টের শরিকদল আর এস পি-র এক প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে। অভিযোগটি উঠছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার রাধানগর-তারানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান অনিলকৃষ্ণ গায়েনের বিরুদ্ধে। স্থানীয় জনগণের অভিমত, অনিলকৃষ্ণবাবু গত পঞ্চায়েত ভোটের আগে নিজের বুথ ও সেইসঙ্গে অন্য বেশ কিছু বুথে ভোট কিনতে দেদার লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছেন। গ্রামবাসীরা ইতিমধ্যেই মহকুমাশাসকের কাছে এই বিষয়ে অভিযোগ জানিয়েছে। সাধারণ মানুষই এইপর্দা ফাঁস করে দেওয়ায় স্থানীয় আর এস পি নেতৃত্বও অনেকটাই বেকায়দায় পড়েছে। রাজ্যের বিরোধীমহলের মতে আর এস পি-র নেতাদের এই ঘটনা নতুন কিছু নয়।

জমি বিতর্ক জিইয়ে রাখছে কেন্দ্র

(১ পাতার পর)

আপত্তি নেই। আপত্তি আছে মেহবুবা মুফতি, ওমর আবদুল্লা, গিলানিদের মতো ভারত বিরোধী রাজনীতিকদের। তাদের উস্কানিতে আজ ৪৩-৪৪ দিন ধরে টানা অশান্তি চলছে জম্মু ও কাশ্মীরে।

কলকাতার বাংলা খবরের কাগজ ও টিভি সংবাদ চ্যানেলের প্রচারের ধামাকায় মনে হতে পারে আর এস এস, বিজেপি, অমরনাথ যাত্রী সংঘর্ষ সমিতি জম্মুর হিন্দুদের উস্কে দিয়ে হাঙ্গামা চালাচ্ছে। সি পি এমের সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাত সম্প্রতি পার্টির মুখপত্র পিপল্‌স ডেমোক্র্যাসিতে লিখেছেন যে বিজেপি হিন্দু ভোট ব্যাঙ্ক দখলের জন্য হিন্দু ভাবাবেগে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। প্রকাশ কারাতের কথায় অযথা গুরুত্ব দেওয়ার দরকার নেই। কারণ, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ জানেন যে 'ছাগলে কী না খায়, সি পি এম কী না বলে'। সবাই জানেন মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক আছে। কিন্তু সেই অর্থে, হিন্দু ভোট ব্যাঙ্ক বলে কিছু নেই। বোধ হয় থাকলে ভালই হতো।

জম্মু ও কাশ্মীরে জমি বিতর্ক নিয়ে বর্তমানে যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার জন্য দায়ি মেহবুবা মুফতি এবং ওমর আবদুল্লা। মেহবুবা মুফতির দল সমর্থন প্রত্যাহার করে রাজ্য সরকারের উপর এমনই চাপ সৃষ্টি করেন যে মুখ্যমন্ত্রী দান করা জমি ফেরৎ নেন। এরপর ২২ শে জুলাই সংসদে আস্থা ভোট প্রস্তাবের উপর বিতর্কে যোগ দিয়ে কাশ্মীরের বিরোধী দল ন্যাশনাল কনফারেন্সের নেতা ওমর আবদুল্লা সদম্ভে ঘোষণা করেন, 'কাশ্মীরের মুসলমানরা জান দেবে কিন্তু হিন্দু তীর্থযাত্রীদের একইঞ্চি জমি দেবে না'। লোকসভায় দাঁড়িয়ে ওমরের এই দাম্ভিক উস্কানি বারুদে দেশলাই কাঠিটি জ্বালায়। এরপেরই ২৩ শে জুলাই ওমরের উক্তির প্রতিবাদে জম্মুতে ৩৫ বছরের যুবক কুলদীপ ডোগরা আত্মাহুতি দেন। গুজরাতের গোধরায় ট্রেনে আগুন দিয়ে হিন্দু তীর্থযাত্রীদের বিনা প্ররোচনায় জীবন্ত পুড়িয়ে মারার ঘটনায় সারা রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদের আগুন ছড়িয়ে ছিল। ঠিক তেমনই কুলদীপের আত্মাহুতি হিন্দুর ক্ষোভ ও বঞ্চনাকে প্রতিবাদের ভাষা দিয়েছে। এই প্রতিবেদন লেখার সময় প্রতিবাদী আন্দোলনে জম্মু ও কাশ্মীরে মোট ১০ জন প্রাণ হারিয়েছেন এবং কমপক্ষে ৫০০ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। জম্মুর ১০০ শতাংশ মানুষ আজ এই প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন।

অন্যদিক, গিলানি, মেহবুবা, ওমররা যে পাকিস্তানের হাতের পুতুল তাও এখন আর অজানা নেই। এই নেতারা কাশ্মীরের ফল ব্যবসায়ীদের বলেছেন যে মূল ভারত ভূখন্ডে ফল পাঠাবেন না। এখন থেকে কাশ্মীরের ফল যাবে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে। এই ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছেন পাক অধিকৃত কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী সরদার আতিক আহমেদ খান। ঘোষণা করেছেন যে কাশ্মীরের ফল বিক্রেতারা পসরা নিয়ে এলে তাঁদের রাষ্ট্রীয় সম্বর্ধনা দেওয়া হবে। এরপরেও বামপন্থী কমরেডরা সব দোষ হিন্দুদের বলে প্রচারের ধামাকা কীভাবে চালাচ্ছেন বোধগম্য হয় না। যেমন বোধগম্য হয় না রামজন্মভূমিতে রাম মন্দির গড়তে ইসলামি আপত্তিতে অথবা রামসেতু ধ্বংস না করলে ভারত-শ্রীলঙ্কা বাণিজ্য প্রসার হবে না এমন একটা প্রচারে। যেটা বোধগম্য হয় তা হলো হিন্দুর ধর্মীয় অধিকার ও ভাবাবেগে আঘাত না করলে এই হিন্দুস্থানে সাচ্চা প্রগতিশীল সেকুলার হওয়া যায় না।

HB ®
INDIA'S NO. 1 IN
ISI MARKED
HEAVY PIPE FITTINGS
HB ® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.
Authorised Distributor
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833
15, College Street, Kol-12
Ph : 2241 7149 / 8174
Sister Concern
Partha Sarathi Ceramics
4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

মরিয়া সিমি, তথ্য-প্রমাণ চেপে যাচ্ছে কেন্দ্র

(১ পাতার পর)

মামলা বিচারাধীন রয়েছে। তারা জেলে বন্দী। মহারাষ্ট্রেরই প্রতিবেশী রাজ্য কর্ণাটকে রাজ্য পুলিশ সিমির এক নেটওয়ার্কের সন্ধান পায়। তারপর সিমির কয়েকজন কর্মীকে বিস্ফোরক সহ গ্রেপ্তার করে। তাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, ধৃতরা সবাই ভালোমতো শিক্ষিত যুবক। এমনকী তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, তারা গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সন্ত্রাসী আক্রমণের সমর্থনে বক্তব্য রেখেছে।

কর্ণাটকের বেলগাঁও জেলার এক গ্রামে তারা পরীক্ষামূলকভাবে বিস্ফোরণও করেছে। হুবলীর কাছে এক জঙ্গলের মধ্যে তারা রীতিমতো এক প্রশিক্ষণ শিবির আয়োজন করেছিল। এসবই পুলিশের পক্ষ থেকে চার্জশীটে অভিযোগ রয়েছে। এসব অভিযোগ ট্রাইবুনাল হয় খতিয়ে দেখেনি অথবা ভারত সরকারের উকিল তথ্য প্রমাণসহ তা পেশ করেনি।

পশ্চিমবঙ্গে সিমির সন্দেহজনক গতিবিধি নজরে আসে ২০০২ সালে হাসিব রাজা নামে এক সিমি কর্মী আর ডি এক্স - সহ ধরা পড়ার পর। তদন্তে দেখা যায় যে হাসিব রাজা কলকাতার হাওড়া ব্রীজ (রবীন্দ্র সেতু) পুরো উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। ২০০৩ সালে দুজন সিমি ক্যাডার সহ মোট পাঁচজনকে পুলিশ হাতে-নাতে গ্রেপ্তার করে। সেসময় তারা কুমারডুবি-বরাকর রেল লাইনের স্লিপারের ক্লীপ খুলছিল।

নিষিদ্ধ অবস্থাতে সিমি গোপনে মধ্যভারতে তাদের কাজকর্মের জাল ভালো করে বিছিয়েছে। আর সেখানে থেকেই ভারতের সর্বত্র তা বিস্তার করেছে। সম্প্রতি সফদর হুসেন নাগৌরি নামে সিমির সর্বোচ্চ নেতাকে ইন্দোর থেকে গ্রেপ্তার হয়। সে সেখানে বসে নার্ভ সেন্টার খুলে পরিকল্পনার রূপরেখা চূড়ান্ত করত। মুম্বই-এ লোকাল ট্রেনের বিস্ফোরণে ধৃত ডঃ তনবীর নাগপুরের মোমিনপুরাতে ইউনানী চিকিৎসা বিষয়ে পড়াশোনার জন্য বেশ কয়েক বছর ছিল। মুম্বাই বিস্ফোরণ সূত্রে অন্ততঃপক্ষে ছ'জন সিমি ক্যাডার নাগপুর থেকে ধরা পড়ে। উত্তরপ্রদেশ, অসম, কেরল, গুজরাট, তামিলনাড়ু বা অন্ধ্রপ্রদেশের ঘটনাও এক। সেসব রাজ্যেও সিমি-ক্যাডাররা আগ্নেয়াস্ত্র, বিস্ফোরক এবং সন্ত্রাসী আক্রমণের ব্লু-প্রিন্ট সহ ধরা পড়েছে। ক্যাডারদের ধরা পড়ার ফলে হীনবল হওয়া বা পুলিস কর্তৃক কড়া নজরদারি ও সর্বোপরি নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও 'সিমি' গোপনে থেকে তাদের কাজকর্ম পুরোদমে চালিয়ে যেতে পেরেছে। গোয়েন্দা বিভাগের ধারণা, এদের বেশ কিছু ক্যাডার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে তলে তলে ভিড়ে গেছে।

উগ্র ইসলামি জেহাদি প্রচারপত্র বিলির কাজও সিমির ক্যাডাররা চালিয়ে গেছে। এতসব ঘটনা সত্ত্বেও ভারত সরকার যে সন্ত্রাসবাদকে দমন করতে চায় এমন কোনও নিশ্চিত বস্তুগত তথ্য প্রমাণ আদালতে পেশ করতে পারেনি।

বর্তমানে আমেরিকাবাসী ও সেখানকার পশ্চিম ইলিনয়িস বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস কম্যুনিকেশনের অধ্যাপক মহম্মদ আহম্মদুল্লা সিদ্দিকি ১৯৭৭ সালের এপ্রিল মাসে আলিগড়ে স্টুডেন্টস্ ইসলামিক মুভমেন্ট অফ্ ইন্ডিয়া (সিমি) প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল ভারতের মুসলমানদের পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক প্রভাব থেকে রক্ষা করে ইসলামি সংস্কৃতিতে যুক্ত করা। প্রাথমিকভাবে সিমি 'জামাতে ইসলামি'-র ছাত্র শাখা হিসেবে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু উগ্রবাদিতার কারণে জামাতের সঙ্গে সখ্যতা টেঁকেনি। জামাত সিমির প্রকাশ্য উগ্রপন্থী কাজকর্ম সমর্থন করত না। ২০০১ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর 'বেআইনী কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইন ১৯৬৭'-এর দ্বারা সিমির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল।

উপরের বিবরণই বলে দেবে নিষিদ্ধ অবস্থাতেও সিমি ভারত জুড়ে ধ্বংসাত্মক কাজে কতটা সক্রিয় ছিল। এখন শোনা যাচ্ছে, কেন্দ্র সরকার ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করবে। সর্বশেষ খবর হল, সর্বোচ্চ আদালত ট্রাইব্যুনালের রায়ের উপর স্থগিতাদেশ জারি করেছে। তিন সপ্তাহের মধ্যে 'সিমি' কে কেন নিষিদ্ধ করা হবে না তা জানাতে নির্দেশ দিয়েছে।

অনুপ্রবেশকারীদের পুশ-ব্যাক করছে না রাজ্য

(১ পাতার পর)

আটকাতে কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়ার কথা সরকারের বিবেচনায় নেই। সম্প্রতি দিল্লীতে বিদেশ মন্ত্রকের এক বৈঠকে এই প্রসঙ্গটিও উঠেছিল। রাজ্য সরকারের অফিসাররা কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি। স্রেফ বলে এসেছিলেন, পুলিশ বাংলাদেশিদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে। বিদেশ ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কর্তারা রাজ্যের অফিসারদের কাছে আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন, এদের মধ্যেই যে জঙ্গিরা ঢুকে নেই তা কে বলল? হয়তো পর্যটক হিসাবে বৈধ পথে এরাজ্যে এসে এইসব বাংলাদেশিদের কেউ কেউ নাশকতামূলক কাজকর্মে যুক্ত হয়ে পড়েছে। শুধু এরাজ্য থেকেই নয়, মহারাষ্ট্র এবং রাজস্থান সরকারও সে রাজ্যে বাংলাদেশিদের ধরে পুশব্যাক করার অভিযানে নেমেছে। এব্যাপারে মহারাষ্ট্র সরকার বিশেষ করে মুম্বই পুলিশ অতি সক্রিয়। প্রতি সপ্তাহে মুম্বাই পুলিশ আট/দশ বাংলাদেশির তালিকা পাঠিয়ে তাদের সে দেশে ফেরত পাঠাতে বলে। রাজস্থান সরকার সাম্প্রতিক জয়পুর বিস্ফোরণের পর থেকে একই পথে চলছে। কিন্তু মহারাষ্ট্র ও রাজস্থান থেকে এ রাজ্যে আসা বাংলাদেশিদের ঠিকমতো পুশব্যাক হচ্ছে কি না তা নিয়ে ওই দুই সরকার সন্দেহ প্রকাশ করেছে। কারণ ইতিমধ্যেই দু'বার অনুপ্রবেশকারীদের একটি করে দল হারিয়ে গিয়েছে বলে জানা যায়। তাতে অন্তত জনা কুড়ি অনুপ্রবেশকারী ছিল। দুই রাজ্য দিল্লীর কাছে অভিযোগ করে বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাংলা-দেশিদের ফেরত পাঠানোর ব্যাপারে সক্রিয় নয়। অনেকক্ষেত্রে সেরাজ্যে গিয়ে ধরাপড়া বাংলাদেশিরা পালিয়ে যাচ্ছে। একদিকে যে সব বাংলাদেশি এরাজ্যে এসে আর ফিরছে না তাদের সরকার খুঁজে পাচ্ছে না। অন্যদিকে কোনও রাজ্য বাংলাদেশি ধরে তাদের পাঠানোর ব্যবস্থা করতে বললেও সরকার চুপ করে বসে আছে। এতেই স্পষ্ট বাম সরকারের অনুপ্রবেশ নিয়ে নীতি কি?

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

জম্মুর চাপা ক্ষোভ

গত দেড় মাস ধরিয়া জম্মুর মানুষ শ্রীনগর ও দিল্লীর সরকারের মুসলিম তোষণকারী, হিন্দুবিরোধী রাজনীতি ও কাজকর্ম লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে। প্রতি গ্রীষ্মে ভগবান তুষার লিঙ্গকে দর্শন করিবার জন্য হাজার হাজার হিন্দু তীর্থযাত্রী অশেষ কষ্ট সহ্য করিয়া অমরনাথ গুহা মন্দিরে যান। হিন্দু তীর্থযাত্রীদের এই কষ্ট সামান্য লাঘবের উদ্দেশ্যে ৯৭ একর জমি অমরনাথ শ্রাইন বোর্ডকে যাত্রা চলাকালীন ব্যবহারের জন্য হস্তান্তরিত করা হইয়াছিল। উপত্যকার পাকপন্থী রাজনীতিকদের ইহাতেই আপত্তি। সামান্য এই জমি বিতর্ককে কেন্দ্র করিয়া পাকপন্থী কাশ্মীরী মুসলমানরা পরিকল্পিতভাবে অশান্তির আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছে। কাশ্মীর উপত্যকার মুসলিমরা ধর্মগত মুসলিম পরিচয়টাকে আড়াল করিবার উদ্দেশ্যে নিজেদেরকে কাশ্মীরী বলিয়া তুলিয়া ধরিতে চায়। এই হস্তান্তরিত জমি প্রত্যর্পণের দাবিতে উপত্যকার মুসলিমরা রাস্তায় নামিয়া পড়ে। রক্তহিম করা স্লোগান দিতে থাকে। পাকিস্তানের পতাকা উড়াইতে থাকে। ফারুক আবদুল্লার ন্যাশনাল কনফারেন্স এবং মুফতি মহম্মদের পিপুলস্ ডেমোক্রেটিক পার্টি(পি ডি পি) এই উন্মত্ত বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে হাতে হাত মিলাইয়া দাবি করিতে থাকেমুসলিম কাশ্মীর কখনও এইরকম হিন্দু জবরদখলকে সহ্য করিবে না।

কিন্তু ঘটনা হইল, হিন্দুর রক্তে হাত রাঙানো এই সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের পরিবর্তে কংগ্রেস ও তাহার তাঁবেদার জম্মু-কাশ্মীরের বর্তমান রাজ্যপাল পাকপন্থীদের কাছেই আত্মসমর্পণ করিয়া বসিলেন। ভারতের অখন্ডতা ও সংহতির পক্ষে যাহা এক বড় আঘাত। কংগ্রেসের পক্ষে ইহা অবশ্য নতুন নহে। বিচ্ছিন্নতা বাদীদের কাছে কংগ্রেস সরকারের এই হতাশ আত্মসমপর্ণের বিষয়ে সংবাদ-মাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত দুভার্গ্যজনক। অমরনাথ শ্রাইন বোর্ডকে জমি দেওয়ার বিষয়টি বাতিলের নির্দেশ অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ এবং ধর্মনিরপেক্ষ ভাবনা-চিন্তার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হইয়াছে বলিয়া তাহারা মনে করেন। কাশ্মীরীদের ভাবাবেগ ও মানসিকতাকে আঘাত না দিয়া 'কাশ্মীরিয়ৎ' রক্ষা করিবার এই প্রয়াসকে অভিনন্দনযোগ্য বলিয়া সংবাদমাধ্যমে বর্ণনা করা হইয়াছে। এইসব অযৌক্তিক কথাবার্তা একেবারে নগ্ন হইয়া যায় যখন দেখি কংগ্রেস সেই মৌলবাদীদেরই দালালি করিতেছে যাহারা বরাবর ভারত বিরোধিতা করিয়া আসিয়াছে, হিন্দুদের দিয়াছে অভিশাপ। আমাদের এই আশ্চর্যের দেশে সংবাদমাধ্যমের কাছে ইহাই হইতেছে ধর্মনিরপেক্ষতার মাপকাঠি।

এই কদর্য মুসলিম তোষণের বিরুদ্ধে সংবাদমাধ্যমও যখন লজ্জিত হইয়া মৃদু প্রতিবাদ না জানাইয়া পারিতেছে না, জম্মুর মানুষ তখন তীব্র বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়িয়াছে। নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে উপত্যকার এই বঞ্চ নার বিরুদ্ধে ক্ষোভে রোষে রাস্তায় নামিয়া পড়িয়াছে। কার্ফু উপেক্ষা করিয়া বুলেট ও ব্যাটনের সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। জম্মুবাসীর এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদকে সাম্প্রদায়িক, অশোভন, বিঘ্নসৃষ্টিকারী, মুসলিম বিরোধী, উস্কানিমূলক বলিয়া নিন্দা করা হইতেছে। কাশ্মীরের মুসলিম 'সহনশীল' এবং জম্মুর হিন্দুরা 'অকৃতজ্ঞ' বলিয়া প্রচার করা হইতেছে। বছরের ৩৬৫ দিনই কাশ্মীরের মুসলিমরা ভারত সরকারকে কোণঠাসা করিবার জন্য কোনও না কোনও ভাবে চেষ্টা চালাইয়া থাকে। অন্যদিকে নিজেদের অধিকার রক্ষার দাবিতে জম্মুর হিন্দুরা যখন মাত্র ৩৫ দিন ভারত সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে সামিল হইয়াছে, তখনই অনেকে ভ্রু কুঞ্চ ন করিতেছেন। জম্মুবাসীর প্রতিবাদী আন্দোলনকে উপহাস করা হইতেছে। বিশেষত, বামপন্থী বুদ্ধি জীবীরা যেভাবে একদিকে কাশ্মীরী মুসলিমদের তৈরি করা অভিযোগ ও কল্পিত অত্যাচারের কথা সংবাদ মাধ্যমকে গেলানোর এবং অন্যদিকে জম্মুর হিন্দুদের প্রকৃত অভিযোগগুলিকে নস্যাৎ করিবার চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে, তাহা অত্যন্ত উদ্বেগের।

অবশ্য এই ধরনের তথ্য বিকৃতি নতুন নয়। অতীতে আমরা দেখিয়াছি কিভাবে কাশ্মীর উপত্যকার হিন্দুদের বিতাড়নের ঘটনাকে যুক্তিসিদ্ধ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। উপত্যকার পুরো হিন্দু সমাজের উপর নৃশংস অত্যাচারকে সামান্য ঘটনা বলিয়া সংবাদ মাধ্যম নিজেদের দায় সারিয়াছে। নিজেদের পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হইয়া কাশ্মীর পন্ডিতদেরকে কিভাবে স্বদেশেই উদ্বাস্তু হইতে হইয়াছে তাহা সর্বজন বিদিত। অথচ কাশ্মীর মুসলিমদের এই নৃশংসতাকে আড়াল করিবার জন্য 'কাশ্মীরিয়ত'-এর মতো মেকি শব্দ আমদানি করা হইয়াছে। এইসবই এবং এই ধরনের যদি আরও কিছু থাকে তাহা হইলেও সেগুলি সাম্প্রদায়িক নয়। অন্যদিকে হিন্দুরা যদি প্রতিবাদে সোচ্চার হয়, তবে ভারত সরকারের 'ধর্মনিরপেক্ষতা'-র মাপকাঠিতে তাহা শুধু সাম্প্রদায়িক নয়, ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের পক্ষে অপমানজনকও।

গত দুই দশকে এইদেশে যাহারা প্রাপ্ত বয়স্ক হইয়াছে, যাহাদের মধ্যে অনেকে চবিবশ ঘন্টার বৈদ্যুতিন চ্যানেলগুলির ভাষ্যকার, নিজেদের সীমাহীন অজ্ঞতাকে ঢাকিবার জন্য তাহারা যখন অর্থহীন কথাবার্তা বলিয়া থাকে, তখন ১৯৯০-এর ঘটনাগুলির কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। কেননা জম্মু-কাশ্মীরের হিন্দুদের বিরুদ্ধে সেই বছর থেকেই নতুন পর্যায়ে মুসলিমদের ধর্মযুদ্ধে র সূচনা। গত আঠারো বছর ধরিয়া হিন্দু ভারত একের পর এক আঘাত সহ্য করিয়া আসিতেছে। বর্তমান জমি বিতর্কউপত্যকার বঞ্চ নার বিরুদ্ধে জম্মুর হিন্দুদের এই চাপা ক্ষোভে ঘৃতাহুতির কাজ করিয়াছে। ইহা শুধু সংবাদমাধ্যমের বিকৃত 'ধর্মনিরপেক্ষতা'-র ভাব-ভাবনাকেই বিনষ্ট নয়, মুসলিম তোষণের রাজনীতিকেও চিরতরে মুছিয়া ফেলিতে চায়। দিল্লী ও শ্রীনগরের উদ্বেগ ও আতঙ্ক তাই সহজেই বোঝা যায়।

চীনের ভারত বৈরীতার উৎস সন্ধানে

দেবীপ্রসাদ রায়

দীর্ঘ বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে ভারত স্বাধীন হল ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট। আর ১ অক্টোবর ১৯৪৯ চীন পরিবর্তিত হল গণপ্রজাতন্ত্রী চীন-এ। প্রথম থেকেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরু যথেষ্ট ঔদার্য্যের সঙ্গে ভারতের বিদেশনীতি রচনা করেন যাতে এশিয়ার দুই প্রতিবেশী দেশ সহযোগিতার পথে অগ্রসর হতে পারে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক হওয়া সত্ত্বেও চীন তিববতকে গ্রাস করার অভিসন্ধি নিয়েই তার বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করে। এবং প্রথম থেকেই এটি প্রকটিত হয় যে তিববত তার নিকটতম লক্ষ্য হলেও ভারতই তার পরবর্তী লক্ষ্য। এশিয়ায় স্বীয় নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য এবং তার আধিপত্য বিস্তার ও বজায় রাখার জন্য ভারতকে নিরন্তর চাপে রাখার জন্য তিববত গ্রাসই তার প্রথম পদক্ষেপ। ১৯৪৭ সালে চীনা প্ররোচনায় যেমন অন্যতম প্রধান বৌদ্ধ মঠ সেরাতে বিদ্রোহের ঘটনা ঘটেছিল ঠিক তার পুনরাবৃত্তি করার জন্য পিকিং বেতারে তিববতীদের প্রতি বিদ্রোহের আহ্বান জানানো হয়। তা ব্যর্থ হওয়ায় চীন ১৯৫০ সালে ৭ই অক্টোবর পূর্ব তিববত আক্রমণ করে এবং চামড়ো দখল করে নেয়। চীনা চাতুরী অনুধাবনে ব্যর্থ নেহেরু কিন্তু তখনই চীনকে স্বীকৃতি দিয়ে রাষ্ট্রসংঘ কর্তৃক চীনকে স্বীকৃতি দেওয়ানোর প্রক্রিয়ায় সচেষ্ট ছিলেন। তিববতে ভারতের দীর্ঘকালীন স্বীকৃত কিছু অধিকার আছে এ কথা মনে করিয়ে দিলে চীন জানিয়ে দেয় "The problem of Tibet remains a domestic problem of the people's Republic of China and no foreign interference would be tolerated"। জাতীয়তাবাদী স্বার্থ রক্ষার কী রকম দৃঢ় চিত্ত হতে হয় নেহরু চীনের কাছে তা শিখলেও আবার অন্য দিকে মহত্ত্ব দেখিয়ে টীনের মহানুভবতার উদ্রেক প্রয়াসে ব্যর্থতার নজির গড়ে তুলতে থাকলেন। ১৯৫০ সালে জুন মাসের শেষে কোরিয়ায় সংঘর্ষ বাধল, উত্তর কেরিয়ার সশস্ত্র বাহিনী সীমান্ত ৩৮ সমান্তরাল অতিক্রম করে দক্ষিণ কেরিয়ায় ঢুকে গেল — রাষ্ট্রসঙ্ঘ একে 'আক্রমণ' বলেই ঘোষণা করল এবং আমেরিকাকে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সুপারিশ করল। প্রাথমিক সাফল্যের পর আমেরিকা দক্ষিণ কেরিয়ার সাহায্যের জন্য জেনারেল ম্যাক আর্থার-এর নেতৃত্বে ৩৮ সমান্তরাল অতিক্রমে রাষ্ট্রসঙেঘর অনুমোদন পেল। ২ অক্টোবর চৌ এন লাই মধ্যরাতে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের সাথে দেখা করে নেহরুকে তাঁর ভূমিকার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন। নেহরুর প্রয়াসে আমেরিকার ৩৮ সমান্তরাল অতিক্রম বন্ধ হল। এরই মধ্যে নিঃশব্দে তিববতে অধিকার চলতে থাকলে নেহরু কাঙ্খিত 'শান্তিপূর্ণ পদ্ধ তি'-কে পাত্তা না দিয়েই। বি বি সি তে নেহরু বিবৃতি দিচ্ছেন, We in India have had 2000 years of friendship with China. We have difference in opinions and even small conflict but when we hearken back to the long past something of the wisdom of the past helps us to understand each other"। আর সেই সময়ই পিকিং বলে যাচ্ছে—"British Imprealism and running dog India its, through their officially contributed publication have declared in union that Tibet never acknowledged sehine suzarainty over it. Nehru riding the imperialists, whose stooge he is actually consider himself the leader of Asian People." এর পরও বালিতে মুখ গুঁজে থাকা নেহরুকে চীন কূটনৈতিক চুক্তিতে বেঁধে তিববতের ব্যাপারে নিস্ক্রিয় রাখতে 'পঞ্চ শীল চুক্তি'-তে সই করিয়ে নেয়। তার পরিণতি দেশবাসী জানে। সীমান্ত অঞ্চ ল নিয়ে দাবির পর দাবি রেখে চলা, অনুপ্রবেশ, ভারতীয় ভূখন্ড দখলের প্রয়াস — চীনের অনুকূলে এল ও সি পরিবর্তন, এসব চলছেই ভারতকে হীনবল, দমিত রাখার জন্য, যাতে এশিয়ার নেতৃত্বে কোনভাবেই ভারত মাথা তুলতে না

"অন্যান্য দেশগুলির সাথে চীন সীমান্ত বিরোধ মিটিয়ে নিয়েছে, অথচ চীন ভারতের সাথে বিরোধ বাড়িয়েই চলেছে। ভারতকে মারার চেষ্টায় সে ধীর কিন্তু নিশ্চিত প্রস্তুতি"

পারে। এই ভারত বিদ্বেষের উৎস খুঁজতে গেলে আমাদের চলে যেতে হবে গত শতাব্দীর বিশের দশকের শেষ ভাগে যদিও এর মূল উৎস আছে ইতিহাসের আরও গভীরে।

১৯২৭ সাল। এম এন রায় (মানবেন্দ্র নাথ রায়) তখন এক্সিকিউটিভ কমিটি, কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল-এর প্রেসিডিয়াম ও সেক্রেটারিয়েট-এর সদস্য এবং কমিনটার্ণের চীনা কমিশনের যুগ্ম সম্পাদক। ১৯২৬-র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁকে চীন পাঠানো হল, ভ্লাডিভোষ্টক এবং ক্যান্টন হয়ে তিনি চীন যান কৃষিবিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় বাতাবরণ তৈরি করতে এবং রূপায়িত করতে। পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তেন-তু-শিঙ প্রতিষ্ঠিত চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সাথে যুক্ত হন জাতীয়তাবাদী মাও সে তুঙ। এক সময়ে কুয়েমিন্টাং পন্থার ঘনিষ্ঠ, আগে ছিলেন চৌ এন লাই ও চু-তে ইউরোপ দীক্ষার পশ্চাদপট সহ। ১৯২৬ সালে চিয়াং কাইংশেক দক্ষিণপন্থাকে বামপন্থার বিরুদ্ধে জয়ী করেন। তাঁর হেডকোয়ার্টার হয় নানচাং আর উহানে স্থানান্তরিত হয় বামপন্থীদের হেডকোয়ার্টার। এই অবাঞ্ছিত দুই বিরোধী গোষ্ঠীর জন্য সঠিক পথ নির্দেশ করতেই স্ট্যালিন লেনিন-এম এন রায় যুগ্ম তত্ত্বের মধ্যে চীনের জন্য 'রায় তত্ত্ব'কেই প্রাধান্য দেন এবং রায়কে চীনে পাঠান। সপ্তম প্লেনামের সিদ্ধান্তই ছিল চীন কৃষি বিপ্লবের অনুকূলে চীনা বিশেষজ্ঞ রবার্ট সি নর্থের মতে একান্তভাবেই এম এন রায়ের সিদ্ধান্ত।

ক্যান্টনে তিন সপ্তাহ থাকার পর এম এন রায় হ্যানকাওর পথে যান। চ্যাংসাতে পৌঁছালে হুনানের বামপন্থী সরকার তাঁকে বিপুল ভাবে সম্বর্ধনা জানান — প্রবল বৃষ্টিপাতের মধ্যেও দেড় লক্ষের মতো মানুষ উপস্থিত ছিল। কিন্তু এই সংবর্ধনা এবং রায়ের কৃষক আন্দোলনের পথকে মাও সে তুঙ পছন্দ করেননি। সেই একই কারণ— ভারতীয় নেতার প্রাধান্য? চীনা কমিউনিস্ট পার্টির পঞ্চ ম কংগ্রেসে (এপ্রিল-মে) কৃষি-বিপ্লবের প্রশ্নটিই অগ্রাধিকার পায়। মানবেন্দ্রনাথ রায় এই কংগ্রেসে যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন তা হল এই কৃষিবিদ্রোহে নেতৃত্ব দেবে কম্যুনিস্টরা। আশ্চ র্যের বিষয় কার্যকরী কমিটিতে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন বোরুদিন এবং তৎকালীন চীন কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান চেন-তু-শিউ। কিন্তু এই বিরোধিতা সত্ত্বেও বহু ভোটের ব্যবধানে রায়ের এই প্রস্তাবটি পাশ হয়ে যায় সম্ভবত এটা আন্দাজ করেই মাও-সে তুং এই কংগ্রেসে আসেননি। চিঠি পাঠিয়ে ডেলিগেটদের অনুরোধ করেন যাতে মানবেন্দ্রনাথের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়। এরপর বোরুদিনের বাড়িতে পলিটব্যুরো অধিবেশন বসে প্রস্তাবটি কার্যকরী করার পন্থা উদ্ভাবন করতে। এই অধিবেশন চলাকালীন প্রায় মধ্যরাতে সভাতে এসে মাও সে তুঙ ভাষণ দেন ঃ "আমি গ্রাম থেকে আসছি, আমি কৃষকদের মনোভাব জানি। রায়কে উদ্দেশ করে বলেন, 'এরা বাইরের লোক, এঁরা দেশের অভ্যন্তরের কথা কি করে জানতেন? গ্রামাঞ্চ লে আমাদের এখন বিপ্লব করা উচিৎ হবে না, তাতে করে জাতীয় সামরিক বাহিনীকে দুর্বল করা হবে। অর্থাৎ কার্যকরী করার সভাকে পরিকল্পনা ম তোই অকার্যকরী করে দেওয়া হল। এবং মানবেন্দ্রনাথ প্রস্তাবিত চীনের বিপ্লবের পরিকল্পনা ওখানেই শেষ হ'ল। কিন্তু এই ঘটনা দেখিয়ে দিল ভারত বিরোধিতাই এর কারণ। এম এন রায় তথা ভারতীয় প্রতিনিধিকে সে যেখান থেকেই আসুক, যে যোগ্যতাতেই আসুক, প্রাধান্য দেওয়া চলবে না। চীনের এই হল আন্তর্জাতিকতাবাদ এর রূপ — ভূমিপুত্রবাদই আসল কথা। পরবর্তীকালে যে ভাবে মানবেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে এটিকে ব্যবহার করা হল তা থেকেই একটি চক্রান্তের আভাস পাওয়া যায়। এম এন রায় যে স্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন কমিনটার্নে নিজের যোগ্যতায়, তাতে ঈর্ষান্বিত ছিলেন গোপনে অনেকেই। যেহেতু এই ডেলিগেশনের উদ্যোক্তা ছিলেন স্টালিন স্বয়ং, তাই শেষ অবধি এম এন রায়ের মিশনকে সফল মিশন বলা হলেও প্রচারে ব্যর্থতাকেই চুপি চুপি প্রচার করা হয়। কিন্তু বিশ্ববাসীর অজানা নয় যে সে লেনিনের মৃত্যুর পর রেড স্কোয়ারে যে সমাবেশ হয়েছিল তাতে তিন বক্তার মধ্যে একজন হিসেবে এম এন রায়কেই বাছা হয়েছিল। তাঁর গুরুত্ব এমনই ছিল। চীনে ভারতবিদ্বেষ ও বৈরীতার মূল উৎসটি আছে ইতিহাসের গভীরে।

পরাক্রমশালী তিববতের রাজা থাইসং-দিউৎসলের সময়ে (৭৯২ খৃষ্টাব্দ, সাঁইত্রিশ তম রাজা) বৌদ্ধ দর্শকের ভারতীয় পন্ডিত এবং চীনা পন্ডিতদের মধ্যে তিববতে প্রভাব বিস্তারের জন্য তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা গিয়েছিল। বহু আগে থেকেই ধীরে ধীরে প্রবল হওয়া এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসানে এই সময় এক মহতী-বিচার-বিতর্ক সভা আয়োজিত

(এরপর ১৫ পাতায়)

এই সময়

সিপিএমের সম্পত্তি

কমিউনিস্ট পার্টি সাম্যবাদী হিসাবে নিজেদেরকে জাহির করলেও দলের সম্পত্তির সিংহভাগটা বহুবারই বির্তকের সৃষ্টি করেছে। বর্তমানে সাম্যবাদী দলের সম্পত্তির বিষয়টি সুপ্রীম কোর্টের বিচারাধীন। সম্প্রতি কলকাতার এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সম্পাদক জয়দীপ মুখার্জি সিপিএমের সম্পত্তি নিয়ে সি বি আই তদন্তর দাবি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন। এই মামলায় প্রধান বিচারপতি কে জি বালাকৃষ্ণানের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ ওই পিটিশনটি সময় মাফিক আদালতে তোলা হবে বলে রায় দিয়েছে। জয়দীপবাবু তাঁর পিটিশনে উল্লেখ করেছেন, সিপিএমের সম্পত্তি পরিমাণ ২০০ কোটি টাকা। জয়দীপবাবুর অভিযোগ, তাদের আয়ের উৎসের থেকেও দলের সম্পত্তি বেশি। তা হলে এত টাকা এল কীভাবে? এই প্রশ্নই এখন বড় হয়েছে দাঁড়িয়েছে।

কলির শেষ

শাস্ত্রে আছে সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি। পৃথিবীতে এই চারটি যুগই ঘুরে ফিরে আসে। সত্যের শেষ হয়ে ত্রেতা এসেছে। অনুরূপ ভাবে ত্রেতার পর দ্বাপর। দ্বাপরের পর কলি। এবার মায়া সভ্যতার ক্যালেন্ডারে কলিরও শেষ হতে চলেছে। মায়া সভ্যতার ওই ক্যালেন্ডারে ২০১২-র ২১ ডিসেম্বরের পর কোনও তারিখ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ক্যালেন্ডারের হিসাব মতো ২০১২ -র ২১ ডিসেম্বরই কলিযুগের শেষ। সম্প্রতি ইন্ডিয়া টিভি নামে একটি বেসরকারি সংবাদ চ্যানেলে এই সংবাদ সম্প্রচার করা হয়েছে। এদিকে বৈজ্ঞানিকরাও এই বিষয়ে গবেষণা শুরু করে দিয়েছেন। ওই ক্যালেন্ডারের গণনা সঠিক হলে ২০১২ সালেই কলি যুগ শেষ হবে।

সংখ্যালঘু তোষণ

এবার সংখ্যালঘুদের বিশেষ সুযোগ দেওয়ার দৌড়ে যোগ দিল রাজ্য স্বরাষ্ট্রদপ্তরও। গত ৩ আগস্ট স্বরাষ্ট্রসচিব অশোক মোহন চক্রবর্তী পরবর্তীতে নিয়োগ হতে চলা কনস্টেবল, ইন্সপেক্টর ও সাব ইন্সপেক্টর পদের জন্য মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় বিশেষ প্রচার চালাবার নির্দেশ দিয়েছেন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ যাতে বঞ্চনার স্বীকার না হয় সেদিকেও নজর দিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছেন। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সংখ্যালঘু তোষণের চিত্রটা থেকেই পরিষ্কার যে বুদ্ধ দেব বাবুর সকল দপ্তরই ভোটব্যাঙ্কের দিকে তাকিয়ে মুসলিমদের কাছে কল্পতরু হতে চাইছে।

শূন্য শিক্ষক পদ

রাজ্যে শিক্ষক পদ খালি থাকলেও তার জন্য যোগ্য প্রার্থী পাওয়া যাচ্ছে না। চলতি বছরে স্কুল সার্ভিস কমিশন খালি থাকা শিক্ষকপদ পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। ১৩০৪৩টি শূন্য পদের মধ্যে মাত্র ১০,৩৩২ পদের যোগ্য প্রার্থী পাওয়া গেছে। ফলে বাকী পদগুলি এখনও খালি। ৩২ বছর ক্ষমতায় থাকা বাম রাজ্যের এই শিক্ষার চালচিত্র আবারও একবার বুদ্ধি জীবীমহলের কাছে বড় চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কর্ণাটক সরকারের উদ্যোগ

রাজ্যের পর্যটনকেন্দ্রগুলিকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে বেশ কিছু আর্থিক পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করেছে কর্ণাটক সরকার। ১৮০ কোটি টাকা ইয়েদুরাপ্পা সরকার ইতিমধ্যেই অনুমোদন করেছেন। ওই টাকা কোল্লুর, উড়ুপি, কাতীল, কুক্কি প্রভৃতি মন্দিরময় তীর্থস্থানগুলির উন্নয়নে কাজে লাগাবার পাশাপাশি পর্যটন কেন্দ্রগুলির জন্য ট্রেন পরিষেবা ও প্যাকেজ টুরের জন্যও ব্যয় করা হবে বলে জানা গেছে। মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পার এই উদ্যোগে স্বাভাবিকভাবেই খুশি রাজ্যবাসী।

পশ্চি মবঙ্গের অর্থনীতি

পশ্চি মবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে আর্থিক শৃঙ্খলা অগ্রাহ্য করার অভিযোগ করলেন খোদ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া ঋণ মকুব প্রকল্পের সুবিধা নিতে পারছে না রাজ্য সরকার। ফলে বাংলার মানুষকে এর ফল ভোগ করতে হচ্ছে। পশ্চি মবঙ্গে পঞ্চ ায়েত ব্যবস্থারও সুষ্ঠু কাজ হচ্ছে না বলেও তিনি সাফ জানিয়েছেন। তাঁর মতে কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহায়তারও কাজে লাগাতে পারছে না বামফ্রন্ট সরকার। অনেকের মতে, খোদ অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য থেকেই পরিস্কার, সাহিত্যের মানুষ বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্যের রাজ্যে আর্থিক বিকাশ অনেকটাই পিছিয়ে। যার মূলে রয়েছে সরকারের সদিচ্ছার অভাব।

মুসলিমরাও করছে সূর্য নমস্কার

যোগের সুফল পেতে সূর্য নমস্কার শুরু করল মুসলিমরাও। তবে তারা ওঙ্কার ধবনির বদলে উচ্চারণ করছেন 'আল্লাহ'। জম্মু-কাশ্মীরের এক যোগ প্রশিক্ষণ সাজ্জাদ আহমদ মীরের বক্তব্য অনুসারে, গত চার বছরে রাজ্যের ৭৫ শতাংশ মানুষ যোগশিক্ষা নিতে শুরু করেছেন। তাঁর মতে, যোগ এমন এক শিক্ষা যা রাজ্যে হিংসা সৃষ্টিকারীদের বন্দুক ছেড়ে শান্তির পথে নিয়ে আসছে। মীরের প্রশিক্ষক সাবিবর আহমদ যখন যোগের প্রচার শুরু করেন, তখন তাকে মুসলিম মৌলভীদের রক্তচক্ষুর সামনে পড়তে হয়েছিল। মৌলভীদের মতে, যোগ হিন্দু ধর্মের পূজা পদ্ধ তি। কিন্তু সাবিবর এই রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করেই চালিয়ে যেতে থাকেন যোগের অভ্যাস। ধীরে ধীরে সাবিবরের জনসমর্থন বেড়ে চলেছে জম্মু কাশ্মীরে। মীরের মতে, কাশ্মীরের অনেক মৌলভী এবং রাজনৈতিক নেতারাও যোগের অভ্যাস করছেন নিয়মিত।

গিনেস বুকে ভারতীয় কন্যা

মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর নিবাসী শৈলন্দ্র ভাটনাগরের সাড়ে চার বছরের কন্যা আরুষির নাম এবার স্থান পেল গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে। মাত্র ৪.৫ বছর বয়সেই সে ক্যানভাসে ফুটিয়ে চলেছে আকাশ-মাটি, ফুল-ফল, পশু-পাখী প্রভৃতির ছবি। উজ্জ্বয়িনীর কালিদাস অ্যাকাডেমিতে তার ৫২ টি চিত্র সম্বলিত প্রদর্শনীর পর সর্বকনিষ্ঠ ব্যবসায়িক চিত্রশিল্পী হিসাবে তার নাম উঠেছে গিনেস বুকে। ইতিমধ্যেই আরুষির ১২টি চিত্রপ্রদর্শনী হয়ে গেছে, মিলেছে সাতটি পুরস্কার ও ২১টি সম্মান।

অনুপ্রবেশ সমস্যার মোকাবিলায় আন্দোলনে নামছে বিদ্যার্থী পরিষদ

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ সমস্যার মোকাবিলায় রাজ্যজুড়ে বড়সড় আন্দোলনের পথ নামতে চলেছে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এ বি ভি পি)। গত ৮ আগস্ট কলকাতার প্রেস ক্লাবে সংগঠনের রাজ্যসভাপতি রবিরঞ্জন সেন এদিন একগুচ্ছ আন্দোলন কর্মসূচীর কথা ঘোষণা করেন। সমগ্র দেশে তথা পশ্চি মবঙ্গে অবাধে বেড়ে চলা অনুপ্রবেশ সমস্যা রোধে সরকারের ব্যর্থতারও কঠোর সমালোচনা করেন তিনি। এই ভয়ানক সমস্যার মোকাবিলার লক্ষ্যেই পরিষদের এই আন্দোলন বলে তিনি জানান।

রাজ্যে অনুপ্রবেশ সমস্যার ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের পাশাপাশি এই বিষয়ে জনসচেতনার লক্ষ্যে আগামী ১০ সেপ্ট ম্বর বিদ্যার্থী পরিষদ কলকাতায় 'বাংলাদেশ দূতাবাস চলো' অভিযানের ডাক দিয়েছে। আগামী ২০-২১ সেপ্টেম্বর পাটনাতে অনুষ্ঠিত হবে সর্বভারতীয় ছাত্রনেতা সম্মেলন। সম্মেলনেও অনুপ্রবেশ সমস্যার প্রতিরোধে আলোচনা করা হবে। এছাড়াও পরিষদ আগামী ৮ ও ৯ নভেম্বর শিলিগুড়িতে দুদিনের একটি জাতীয় সেমিনারের আয়োজন করতে চলছে। চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসে পরিষদ কিষানগঞ্জে অনুপ্রবেশ সমস্যা কবলিত চিকেন নেক অঞ্চ লেও একটি অভিযানের ডাক দিয়েছে। এই অভিযানকে লক্ষ্য রেখে কয়েকমাস ধরে বিদ্যার্থী পরিষদ এ বিষয়ে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাবে। এ ব্যাপারে সরকার কার্যকরী ভূমিকা না নিলে তারা আরও বড়সড় আন্দোলনেরও হুমকি দিয়েছে। তাদের এই আন্দোলনে ছাত্রসমাজ থেকে সুশীল সমাজেরও সক্রিয় সহযোগিতা আছে বলে পরিষদ দাবি করেছে।

অসম চুক্তির ভিত্তিবর্ষ নিয়ে আপত্তি বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। অসম চুক্তি (১৯৮৫) অনুসারে অসমের নাগরিকদের জাতীয় নাগরিক পঞ্জীয়ন সূচী তৈরির চূড়ান্ত ভিত্তিবর্ষ নিয়ে অসম প্রদেশ বিজেপি আপত্তি জানাল। গগৈ সরকার ২৫ মার্চ, ১৯৭১-কে ভিত্তিবর্ষ ধরে এই নথি তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে। রাজ্য বিজেপি-র বুদ্ধি জীবী সেল এ নিয়ে ৩ আগস্ট এক আলোচনা চক্রের আয়োজন করে। গুয়াহাটির গৌরী সদনে আলোচনাচক্রের প্রধান বক্তা ও প্রবীণ সাংবাদিক ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ২৫ মার্চ ১৯৭১-কে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে (অসমে) আসার সর্বশেষ দিন ধরার বিষয়ে তীব্র আপত্তি তোলেন। ওই তারিখের কোনও সাংবিধানিক বৈধতাই নেই বলে তিনি উল্লেখ করেন। ১৯৫২ সালকে ভিত্তি করে সে সময়ের ভোটার তালিকায় যত মুসলমান নাগরিক অসমে ছিল তাদের জন্য পৃথক নির্বাচনী এলাকা তৈরির তিনি দাবি জানান। এছাড়া অসমে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ রোধে ভারত-বাংলা সীমান্তে আরও বেশি সংখ্যক প্রহরী নিয়োগের প্রস্তাব দেন। আলোচনা চক্রের অন্যতম বক্তা ডঃ রোহিণীকুমার বড়ুয়া তরুণ গগৈ নেতৃত্বাধীন সরকার বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছে বলে অভিযোগ করেন। এছাড়া সভায় বক্তব্য রাখেন লোকজাগরণ মঞ্চে র আহ্বায়ক দয়ালকৃষ্ণ বরা। তিনি বলেন, জাতীয় নাগরিক পঞ্জীয়ন সূচী কেবল আই ওয়াশ, লোক দেখানো। তিনি সাবধানবাণী উচ্চারণ করে বলেন, আগামী ২০০১-র জনগণনায় অসমের আরও এগারোটি জেলা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে।

অনাহারে রেকর্ড করেছে পশ্চিমবঙ্গ

প্রায়শঃই এ-রাজ্যের সরকারি প্রচার মারফৎ বলা হয় — রাজ্য অমুক-তমুক বিষয়ে দেশের মধ্যে প্রথম হয়েছে; যেমন মৎস্য উৎপাদনে নাকি এ রাজ্য প্রথম। অন্ধ্রের মাছ না এলে মৎস্যমুখী বাঙালির কি হতো? তবে এবার সব কিছুকে টেক্কা দিয়েছে রাজ্যে অনাহারীর সংখ্যা। ২০০৭ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসের জাতীয় নমুনা সমীক্ষায় দেখা গেছে মরসুমী অনাহারে এ রাজ্য প্রথম স্থান অধিকার করেছে। মরসুমী অনাহারীর সংখ্যা হল ১ কোটি। আমলাশোল এবং চা বাগানের শ্রমিকদের অনাহারে মৃত্যু অস্বীকার করা হলেও এই সমীক্ষার রিপোর্টে জানা যায় ১২ লক্ষ মানুষ সারা বছরে অনাহারে থাকেন। এ ব্যাপারে এ-রাজ্য সারা ভারতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। বিহার-ঝাড়খণ্ড এ রাজ্য থেকে অনেক ভাল অবস্থায় আছে।

পশ্চিমবঙ্গের ১ কোটি ৫৭ লক্ষ ১৫ হাজার ৯১৫ টি পরিবারের ১০.৬ শতাংশ মানুষ বছরের বেশ কিছু সময়ে অনাহারে থাকেন। সারাবছর অনাহারে থাকেন ২ লক্ষ পরিবারের ১২ লক্ষ মানুষ। ছিঃ, ৩০ বছরের অধিক সময়ে সিপিএম পরিচালিত বামফ্রন্ট সরকার তাহলে কী করলো? স্মরণ করা যায় আর এস পি নেতা ও মন্ত্রী ক্ষিতি গোস্বামী এক সভায় বলেছিলেন, অত্যন্ত লজ্জার কথা যে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে অনাহারে লোক মরে। এই সরকারের মন্ত্রী হিসাবে পরিচয় দিতে আমার ঘৃণা হয়।

এ রাজ্যের বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। বিদ্যুৎমন্ত্রী বলেছেন এ অবস্থা পূজা অবধি থাকবে। কাটোয়াতে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সম্পর্কে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বিদ্যুৎ মন্ত্রী রাগ করে বলেছেন — "কাটোয়ায় কি আমার বাবার শ্রাদ্ধ হচ্ছে?" চমৎকার কথা — ডঃ শঙ্কর সেন যখন বিদ্যুৎমন্ত্রী ছিলেন তিনি কোনও দিন এ-রকম ক্ষুব্ধ হননি। মৃণালবাবু

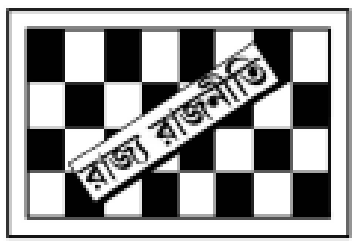

নিশাকর সোম

ব্যর্থ মন্ত্রী।

অবশেষে জুনিয়র ডাক্তারদের ধর্মঘট তুলে নেওয়া হল। রোগীদের এবং তাদের আত্মীয়স্বজনের কষ্টের লাঘ্বনার কি অবসান হবে? স্বাস্থ্য-মন্ত্রী সূর্যকান্ত মিশ্র এই ধর্মঘটের ব্যাপারে নিজের অপদার্থতা প্রমাণ করেছেন। শোনা যায় জুনিয়র ডাক্তারদের মধ্যে পার্টি সংগঠন গড়ার দায়িত্বে আছেন রাজ্য বিধানসভার মাননীয় স্পিকার-এর পুত্র। তিনিও ব্যর্থ। এখনই মেডিক্যাল পরিষেবায় ধর্মঘট নিষিদ্ধ হওয়া দরকার নয় কি? সূর্যবাবু কলকাতার হাসপাতালগুলি পরিদর্শন করুন। দেখুন পরিবেশ — হাসপাতালের রাস্তায় মল-মূত্র-রোগীর পরিত্যাক্ত জামা-কাপড় পাওয়া যায়। কয়েকদিন আগে হাইকোর্টের আদেশে সিপিএম-এর রাজ্য-কমিটির সম্পাদক বিমান বসু, রাজ্যসভা তথা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শ্যামল চক্রবর্তী, এবং বিনয় কোঙার হাইকোর্টে যান। সেখানে বিমানবাবুর উদ্দেশ্যে 'ধর-ধর" বলে চিৎকার হলে-হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। বিমানবাবু নিজের সাথীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আস্তিন গুটিয়ে ঘুঁষি ছুঁড়তে থাকেন বলে সংবাদপত্রে লেখা হয়েছে এবং বক্সার বিমান বসুর আলোকচিত্রও প্রকাশিত হয়েছে। ধন্য বিমানবাবু। তিনি চারবার আদালত ও বিচার ব্যবস্থাকে হেয় করেছেন। এই বিক্ষোভ তারই প্রতিক্রিয়া।

৫ আগস্ট মুজফ্‌ফর আহমেদ-এর জন্মদিনের সভায় জ্যোতি বসুর লিখিত বক্তব্য-এ জানা যায় যে, পার্টির অবাঞ্ছিত কার্যকলাপে যুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। জ্যোতিবাবু বলতে পারেন এই অবাঞ্ছিতদের পার্টিতে কে বা কারা এনেছেন? কেন পার্টি এতদিন ধরে এদের পুষ্ট হবার সুযোগ দিলেন। এই দিনেই সিপিএম-এর রাজ্য কমিটির সম্পাদক বিমান বসুও বলেছেন, "যারা পার্টিতে ব্যক্তি স্বার্থে আছেন — তাদের চিহ্নিত করে তাড়িয়ে দিতে হবে।" বিমানবাবু আপনার রাজ্য কমিটির সব সদস্য কি ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে?

এ রাজ্যের মন্ত্রিসভার সব সদস্য কি ব্যক্তি স্বার্থে কোনও সুযোগ সুবিধা নেয়নি?

"পশ্চিমবঙ্গের ১ কোটি ৫৭ লক্ষ ১৫ হাজার ৯১৫ টি পরিবারের ১০.৬ শতাংশ মানুষ বছরের বেশ কিছু সময়ে অনাহারে থাকেন। সারাবছর অনাহারে থাকেন ২ লক্ষ পরিবারের ১২ লক্ষ মানুষ। ৩০ বছরের অধিক সময়ে সিপিএম পরিচালিত বামফ্রন্ট সরকার তাহলে কি করলো?"

বিমানবাবু কাঁচের ঘরে বসে অন্যকে ঢিল মারা কি ঠিক? আমি জানি দু'জন মন্ত্রীর পত্নীদের এন. জি.ও আছে। এই এন জি ও -গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সাহায্য পায়। তাইতো দেখি একটি এন জি ও জ্যোতিবাবুকে দশ লক্ষ টাকার চেক গিফট করে। জনৈক ঠিকাদার নাকি সুভাষ চক্রবর্তীকে বাড়ি গিফ্‌ট দেন। সুভাষ বাবু একেবারে নিঃস্বার্থ (?)-ভাবে ব্যক্তি স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে এই গিফট নিয়েছেন। তাই তো সুভাষবাবু প্রমোশন পেয়ে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীতে স্থান পেলেন — তাঁর শ্রীকৃষ্ণের চাপেই এটা হল। এসব ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে 'পার্টি স্বার্থে' হয়েছে। কী মজা? পার্টিতে নিচের তলায় একটা কথা চালু হয়েছে — "নেতারা করলে লীলা— আমরা করলে বিলা।" বিমানবাবু, বলি কি ডাক্তার নিজের রোগ সারাও। কে কাকে তাড়াবেন। উপর থেকে পচন আরম্ভ হয়েছে — নিচের তলায় তা সঞ্চারিত হয়েছে। একজনের ৩/৪টি গাড়ি, ৫/৬ ফ্ল্যাট, কর্পোরেট হাউসের এম ডি-এর মতো জীবনযাত্রা — এই তো বেশ কিছু নেতার অবস্থা। নাম দাবি করলে তালিকা ছেপে দেব।

সুভাষ চক্রবর্তী চীন দেশের পরিবহন পরিকাঠামো, সরেজমিনে দেখে অভিজ্ঞতার বিনিময় করার জন্য অলিম্পিক অনুষ্ঠানের সময়ে চীনের বেজিঙে যেতে চেয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার এ সময়ে যাওয়াতে বাধা দিয়েছেন। কারণ চীন এখন অলিম্পিক নিয়েই ব্যস্ত। বিমানবাবু এ-সম্পর্কে কি বলেন? তিনি পার্টি থেকে তাড়ানোর কথা বলেছেন — এর প্রতিক্রিয়া ভয়ানক হবে। নিচের তলায় কর্মীরা পার্টি সভায় নেতাদের ব্যক্তি স্বার্থ, আচরণ নিয়ে ফেটে পড়ছে এবং আরও ফেটে পড়বে। বিমানবাবু আপনারা কিছুই করতে পারবেন না, কারণ ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হবে। কম্বলের লোম বাছতে গেলে গোটা কম্বলটাই ফেলে দিতে হবে। নিচের তলায় কমরেডরা বলেন, দলাদলিতে যা-কে বা যাদের হারানো যাবে না, শুধু বেছে বেছে তাদেরই তাড়ানো হবে। অতীতে দেখা গেছে অধ্যক্ষ পীযূষ দাশগুপ্ত — যিনি পার্টির তাত্ত্বিক নেতা ছিলেন — তাঁর বিরুদ্ধে কংগ্রেসের সঙ্গে 'হবনব' করার জন্য বহিষ্কার করা হয়। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই লক্ষ্মী সেন কংগ্রেসি বিধায়ক নন্দ ব্যানার্জির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতেন — একথা হরিনারায়ণবাবু আমাদের বলেছিলেন। সেই ট্রাডিশন আজও চলেছে।

অন্যরকম

মনের জোরে

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। 'ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়' কিম্বা চেষ্টা থাকলে উপায় হয়, কথাগুলো বাংলায় ভাব সম্প্রসারণের মধ্যেই যে সীমাবদ্ধ থাকে না তার ব্যতিক্রমী হলেও কিছু উদাহরণ আজও দেখতে পাওয়া যায়। 'তাঁর' কৃপা হলে পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করতে পারে এটা প্রচলিত প্রবাদ কিন্তু কেবল তাঁর কৃপা নয়, নিজের ইচ্ছা, অদম্য ইচ্ছা এবং চেষ্টা কোনও মানুষকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে তার একটা উজ্জ্বল উদাহরণ হলেন দিল্লীর বাসিন্দা শ্রীমতী অনিতা ঘাই।

বলতে গেলে আক্ষরিক অর্থেই তিনি পঙ্গু। খুব ছোট বেলাতেই পোলিও তাঁর দু'পায়ের চলৎশক্তি প্রায় কেড়ে নিয়েছে। তার ওপর বুকে বাসা বেঁধেছে কর্কট রোগ। তা সত্ত্বেও যেভাবে ক্যালিফোর্নিয়া, অকল্যাণ্ড, মিলান, টোরোন্টোয় টো টো করে ঘুরতে যাচ্ছেন তাতে তাঁকে এককথায় একজন বিশ্বভ্রমণকারী বললেও বোধহয় কম বলা হবে। এই পরিক্রমা অবশ্য গোদা বাংলায় যাকে বলে টো-টো কোম্পানি করে বেড়ানো তা নয়। উচ্চশিক্ষিতা অনিতার দিল্লীর একটি কলেজের রিডার হিসাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে 'লেকচার' দিতে যাওয়া। ডঃ ঘাই-এর মতো একজন প্রতিবন্ধী এবং ক্যান্সারের রোগীর পক্ষে এটা কি একটা বিরাট ব্যতিক্রম নয়?

অনিতা ঘাই— প্রতিবন্ধীদের জন্য কাজ করাই তাঁর ব্রত।

জীবন সংগ্রামে এই ব্যতিক্রম শ্রীমতী ঘাই-এর আবাল্য সঙ্গী। সেই সঙ্গে কাজ করেছে তাঁর মাতা-পিতার প্রেরণাও। তাঁরা কোনও সময়ই বুঝতে দেননি অনিতা পোলিও-পঙ্গু। সব সময়ই বলে এসেছেন 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'। সেই সুবাদেই নজর কাড়া নম্বর নিয়ে তাঁর দ্বাদশ শ্রেণী পাশ করা। মনস্তত্ব বিজ্ঞান নিয়ে স্নাতক স্তরে ভর্তি হওয়া এবং প্রত্যেকটি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করা। এরপর স্নাতকোত্তর, এমফিল, পি এইচ ডি ইত্যাদি করে ১৯৮৪ সালে অধ্যাপনা শুরু।

কেবল বিদ্যাচর্চাতেই নয়, অনিতা ১৯৮৯ সালে প্রতিবন্ধী মহিলা ড্রাইভিং প্রতিযোগিতাতেও 'শ্রেষ্ঠ মহিলা ড্রাইভার' এর শিরোপা লাভ করেছেন, শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রতিবন্ধীদের ওপর বই লিখেছেন। লেখিকা হিসাবে তাঁর সবচাইতে বড় কীর্তি সম্ভবত প্রতিবন্ধীদের বোঝো — এই তত্ত্ব নিয়ে প্রকাশিত পুস্তক 'আণ্ডার - স্ট্যাণ্ডিং ডিসেবিলিটি'। সম্মান, অভিনন্দন, পুরস্কার লাভ এখন তার জীবনে বলতে গেলে আখছার ঘটনা। কিন্তু তাঁর জীবনে সবচাইতে বড় লক্ষ্য হল সমাজসেবা। প্রতিবন্ধীদের জন্য কাজ করাই তাঁর জীবনে সবচাইতে বড় স্বপ্ন। এটাকেই তিনি সবচাইতে বেশি প্রাধান্য দিতে চান। এত সমস্ত ব্যস্ততার মধ্যেও 'অল ইণ্ডিয়া উওমেন ফোরাম'-এর সঙ্গে যুক্ত থেকে প্রতিবন্ধী বিষয়ে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন নিজের শরীরে পঙ্গুত্ব নিয়েও। আসলে অনিতার মনের জোর অসাধারণ, আর পাঁচজন উচ্চ শিক্ষিতা মহিলার তুলনায় এখানেই তিনি সম্পূর্ণ অন্যরকম।

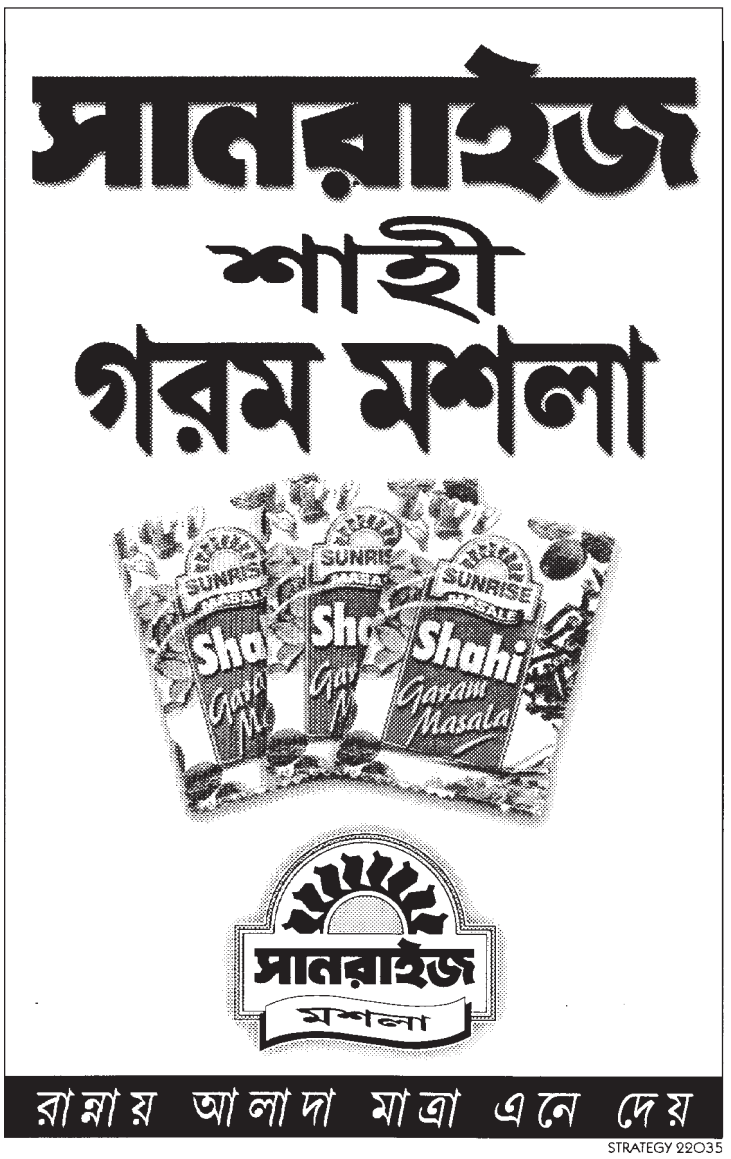

অসমের সন্ত্রাসবাদীদের ট্রেনিং দিচ্ছে মাওবাদীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। অসমের সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর ক্যাডাররা ঝাড়খণ্ডে গিয়ে মাওবাদীদের কাছে গেরিলা লড়াই এবং সেইসঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরক ব্যবহারের তালিম নিচ্ছে। গুয়াহাটিতে গত ৩০ জুলাই নিরাপত্তা বিভাগের এক অফিসার একথা জানিয়েছেন। ওই দিন গোলাঘাট জেলা কর্তৃপক্ষের কাছে দু'জন আনলা (আদিবাসী ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি) সন্ত্রাসবাদী আত্মসমর্পণ করেছে। তারাই জানিয়েছে তাদের দলের ২৪ জন ক্যাডার গত জানুয়ারি মাস থেকে ঝাড়খন্ডে মাওবাদীদের কাছে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। ওই দুই আনলা-সন্ত্রাসবাদীর নাম মিখাইল বিনা এবং রাজু গৌড়। তারা পুলিশকে জানিয়েছে যে আনলা-র ৩০০ জন ক্যাডার রয়েছে। তাদের হাতে রয়েছে একে সিরিজের ডজন ডজন অ্যাসাল্ট রাইফেল, রিভলবার এবং গ্রেনেড।

২০০৪ সালে অসমে চা-বাগানে কর্মরত জনজাতি শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য আনলা গঠিত হয়। ২০০৭ সালের ১৩ ডিসেম্বর রাজধানী এক্সপ্রেসে বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করে তারা জনসমক্ষে পরিচিতি লাভ করে। ওই বিস্ফোরণে ৫ যাত্রী নিহত এবং ৯ জন

উত্তর-পূর্বাঞ্চল

যাত্রী আহত হন। এছাড়াও আনলা-র সঙ্গে নাগাল্যাণ্ডের শক্তিশালী সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী NSSCN (IM)-এর এক লিখিত চুক্তি হয়েছে। উভয়েই সম্মিলিত ভাবে নিরাপত্তাবাহিনীর উপর আক্রমণে যাবে। কেউ একে অপরের এলাকায় আগের থেকে না জানিয়ে তোলা আদায় করবে না। একজন উচ্চপদস্থ নিরাপত্তা কর্মকর্তার বক্তব্য, আনলা তাদের এতাবৎ অস্ত্রভাণ্ডারের সিংহভাগই এন এস সি এন (আই এম)-এর কাছ থেকেই সংগ্রহ করেছে। গত বৎসর নভেম্বর মাসে চা-জনজাতিরা 'তপসিলী উপজাতির' তকমা পাওয়ার জন্য গুয়াহাটিতে যে হিংসাত্মক আন্দোলন করেছিল তা থেকে 'অদিবাসী' সেন্টিমেন্টকে সুড়সুড়ি দিয়ে ফায়দা লোটার সবরকম চেষ্টা করছে।

অসম পুলিশের দৃঢ় ধারণা আনলা নেতারা ঝাড়খণ্ড থেকেই অপারেশন চালাচ্ছে। সংগঠন শুরুর প্রথম দিকে 'আনলা' কার্বি আলং জেলার কুকি জনজাতিদের সন্ত্রাসবাদী সংগঠন কুকি রেভলিউশনারি আর্মির কাছ থেকেই সবরকম সাহায্য নিত। পরে তারা এন এস সি এন (আই-এম)-এর ছত্রছায়ায় চলে যায়। এমনকী তারা মাওবাদীদের কাছে ক্যাডারদের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করে। উল্লেখ্য, এখানে যোগাযোগের কাজটা করেছে ডেভিড নামে একজন খৃষ্ট মতাবলম্বী আনলা নেতা।

অসমে দুর্বার গতিতে 'দুর্নীতির বাতরি'

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। অসমের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের একটি প্রকাশনা নিয়ে বেশ বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। প্রকাশিত পুস্তিকার নাম — 'দুর্বার গতিরে উন্নতির বাতরি অসম ২০০৮'। অসমের বর্তমান ক্ষমতাসীন কংগ্রেস (সোনিয়া) ও বোড়ো পীপুলস্ প্রগ্রেসিভ ফ্রন্টের জোট সরকারের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ওই পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে। নামও রয়েছে তাদেরই। পুস্তিকাটি ছাপা হয়েছে ২৫ হাজার, তার মধ্যে এক হাজার বই ইংরেজিতে ছাপা হয়েছে। প্রতিটি বই ছাপাতে খরচ হয়েছে ৬১.৩৯ টাকা। মোট খরচ ১৫ লক্ষ টাকা। প্রকাশক-এর জায়গায় নাম আছে— 'ডাইরেকটরেট অফ্ ইনফরমেশন এ্যাণ্ড পাবলিক রিলেশন - অসম'। মুদ্রকঃ প্রিন্টিং উদ্যোগ, বামুনি ময়দান, গুয়াহাটি - ২১।

বিস্ময়ের বিষয় হল, এক প্রশ্নের উত্তরে ডাইরেক্টরেট অফ্ ইনফরমেশন অ্যাণ্ড পাবলিক রিলেশন-এর পক্ষ থেকে ওই নামের কোনও পুস্তিকা ছাপার কথা অস্বীকার করা হয়েছে। তাই প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে পুস্তিকা কে প্রকাশ করল?

'রাইট টু ইনফর্মেশন' আইন অনুসারে প্রশ্ন করাতে রাজ্য সরকারের মুদ্রণ ও স্টেশনারি বিভাগ জানিয়ে দেন, রাজ্য সরকারের দু'বছর পূর্তি উপলক্ষে ওই পুস্তিকা ছাপা হয়েছে এবং খরচ হয়েছে ১৫.৩৪ লক্ষ টাকা।

প্রচলিত সরকারি আইন অনুসারে সরকারের মুদ্রণ ও স্টেশনারি বিভাগ এভাবে পুস্তিকা ছাপার কাজ করতে পারে না। এবার প্রশ্ন, যদি DIPR পুস্তিকা ছাপার খরচ বহন না করে থাকে তাহলে টাকা কোথা থেকে এল? ওয়াকিবহাল মহলে পুস্তিকার সংখ্যা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। সামান্য একটা পুস্তিকা নিয়েই যদি সরকার নিয়ম-নীতি, আইন-

মুখ্যমন্ত্রী ত(ণ গগৈ

কানুনের তোয়াক্কা না করে, তাহলে সব মিলিয়ে দুর্নীতির শিকড় অসমে কতটা ছড়িয়েছে তা সহজেই বোঝা যায়। সূত্র অনুসারে তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তরের সচিব সুভাষ দাস পুরো বিষয়টা জেনে তো একেবারে থ হয়ে গেছেন। তদন্ত হচ্ছে, শেষ না হওয়া পর্যন্ত টাকা-পয়সা মেটানো হচ্ছে না।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্য সরকারের তাবৎ সরকারি ছাপাছাপির কাজ যারা করেন তারাই ওটা ছেপেছেন। অর্থাৎ যারা রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা ছেপে থাকে, তারাই তা করেছে। ওই সাপ্তাহিকের নাম — রাজ্যের বার্তরি। অথচ ওই প্রেসকে কালো তালিকাভুক্ত করার বদলে সরকার আরও বেশি বেশি করে ছাপার অর্ডার দিয়ে যাচ্ছে।

ত্রিপুরায় বিজেপির মহাকরণ অভিযান

সংবাদদাতা ।। গত ৫ আগস্ট বিজেপি ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটির উদ্যোগে আগরতলার আস্তাবল ময়দানে এক বিশাল জনসভা এবং পরে মহাকরণ অভিযান করা হয়। ওই জনসভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় নেত্রী ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুষমা স্বরাজ। তিনি এই প্রথম ত্রিপুরায় এলেন এবং সাংবাদিকদের সাথে এক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। পরে জনসভায় কেন্দ্রের ইউপিএ সরকারকে মূল্যবৃদ্ধি, কৃষকদের আত্মহত্যা, অমরনাথ বিতর্ক, সেতু সমুদ্রম প্রকল্প ইত্যাদি নিয়ে তুলোধূনো করে ছাড়েন।

রাজ্যের প্রসঙ্গে টেনে সুষমাজীর বক্তব্য ছিল, গত বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস এই রাজ্যে সি পি এম-কে ক্ষমতা উপহার দিয়েছে। এখন তাদের সদ্য ডিভোর্স ঘটেছে মাত্র। এছাড়া জনসভায় বক্তব্য রাখেন সর্বভারতীয় মহিলা মোর্চার সভানেত্রী কিরণ মাহেশ্বরী এবং প্রদেশ বিজেপি সভাপতি নীলমণি দেব।

জনসভার শেষে শ্রীমতী স্বরাজ মহাকরণ অভিযানেও নেতৃত্ব দেন। মহাকরণ অভিযান প্রায় ১০ হাজার বিজেপি কর্মী-সমর্থক মিছিল করে যখন এগিয়ে যাচ্ছিল তখন হঠাৎ বিজেপি কর্মীদের উপর পুলিশ প্রথমে জলকামান এবং পরে লাঠি চার্জ করে। বামফ্রন্টের ক্যাডারবাহিনীর হাত ধরেই পুলিশ কর্মীদের এই অমানবিক আচরণ। শেষে প্রদেশ নেতৃবৃন্দ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে মুখ্যসচিবের সাথে সাক্ষাৎ করে ৮ দফা দাবীর ভিত্তিতে এক স্মারকলিপি প্রদান করেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন বিজেপি প্রদেশ সহ-সভাপতিদ্বয় কেশব দেবনাথ, সুজিত কুমার দত্ত, প্রদেশ সাধারণ সম্পাদকদ্বয় মানিক দাস, রামপ্রসাদ পাল, সংগঠন সম্পাদক সুন্দর পাল, শ্যামল রায় ও মহিলা মোর্চার প্রদেশ সভাপতি শ্রীমতী প্রতিমা ভৌমিক।

ইসলামপুরে ১৭ লক্ষ টাকার হাতির দাঁত উদ্ধার

মহাবীর প্রসাদ টোডি ।। সম্প্রতি ইসলামপুর কাস্টমস্ দপ্তর প্রায় ১৭ লক্ষ টাকার মূল্যের হাতির দাঁত উদ্ধার করেছে বলে জানা গেছে।

কাস্টমস্ সূত্রে জানা গেছে যে, কোনও গোপন সূত্রে খবর আসে যে বাসে হাতির দাঁত আসছে। ইসলামপুর কাস্টমস্ তল্লাশির জন্য বিধাননগর এলাকায় ওৎ পেতে অপেক্ষা করছিল। এবং বাসে তল্লাশি চালিয়েও কোনোও হাতির দাঁতের হদিস পাওয়া যায়নি। কিন্তু হঠাৎ করে অ্যাটাচি হাতে সন্দেহজনক এক লোককে দেখে কাস্টমস্ দপ্তরের কর্মীরা তাকে তাড়া করে। তাড়া খেয়ে ওই ব্যক্তিটি অ্যাটাচি ফেলে পালিয়ে যায়। ঐ অ্যাটাচিতে আটটি হাতির দাঁত পাওয়া যায়। যার ওজন ১৬ কেজি ৭০০ গ্রাম।

ইসলামপুর কাস্টমস্ অফিসার জানান যে, দাঁতগুলি গুয়াহাটি থেকে আসছিল। সেগুলি নেপালে পাচার করা হত বলে কাস্টমসের ধারণা। এই হাতির দাঁতের আনুমানিক মূল্য প্রায় ১৬ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা হবে। উল্লেখ্য, উত্তর দিনাজপুর জেলার সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিকে চোরাকারবারী, সন্ত্রাসবাদীরা নানা নাশকতামূলক কাজের জন্য করিডর হিসাবে ব্যবহার করছে। কারণ ইসলামপুর মহকুমা ভৌগোলিক অবস্থান এমন যে একদিকে বাংলাদেশ সীমান্ত সহ পাশেই নেপাল ও বিহার থাকায় এসব কাজ করে গা ঢাকা দেবার সুযোগ থাকায় এরা এই এলাকাকে অনেকদিন ধরেই করিডর হিসাবে ব্যবহার করছে।

বাংলাদেশ সীমান্তের লাগোয়া হওয়ায় ইসলামপুর এমনিতেই চোরাচালানকারীদের সহজ পথ। নজরদারির ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে অনেক ফাঁক-ফোকর।

ত্রিপুরায় শুরু হল সেবাধাম

সংবাদদাতা ।। গত ৬ আগস্ট ত্রিপুরার চাম্পামুড়া গ্রামে গত ৬ আগস্ট ডাঃ হেডগেওয়ার স্মারক সমিতির পরিচালিত সেবাধামের শিলান্যাস করলেন পরমার্থ সাধক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা মহামন্ডলেশ্বর স্বামী বিষ্ণুপুরীজী মহারাজ।

ওই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্ব ক্ষেত্রের প্রচারক সুনীলপদ গোস্বামী এবং পূর্ব ক্ষেত্রের সেবা প্রমুখ ভাস্কর কুলকার্ণী।

এই সেবাধামের মাধ্যমে যে প্রকল্পগুলি আরম্ভ হবে সেগুলি হল — ১। ছাত্রাবাস, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ২। ভ্রাম্যমান (এম্বুলেন্স) চিকিৎসার ব্যবস্থা ও স্থায়ী চিকিৎসা কেন্দ্র (ও পি ডি), প্রাকৃতিক চিকিৎসা, যোগাসন, প্রাণায়াম ও নিউরোথেরাপি চিকিৎসা কেন্দ্র, ৩। জৈব সার উৎপাদন কেন্দ্র ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ৪। শিশু শিক্ষা ও সংস্কার কেন্দ্র, ৫। পানীয় জল, ফুল বাগান ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হবে।

উল্লেখ্য, এমন একদিনে ৬ আগস্ট ১৯৯৯ সালে নিবেদিত প্রাণ চারজন আর. এস. এস. কর্মী সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা অপহৃত হয়েছিল। দীর্ঘদিন নির্যাতন করে তাঁদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে বলে পরে জানা গেছে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত এই চার জন সঙ্ঘকর্মী ছিলেন শ্যামল সেনগুপ্ত, দীনেন দে, সুধাময় দত্ত ও শুভঙ্কর চক্রবর্ত্তী আজ এই সেবাধাম তাঁদের স্মৃতিতেই নির্মিত হতে চলেছে।

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বজরঙ্গ দলের সভা

সংবাদদাতা।। সারা বিশ্বে তথা ভারতবর্ষে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বজরঙ্গ দলের ডাকে গত ২ আগস্ট কলকাতায় শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে একটি পথ সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় বক্তব্য রাখেন কলকাতা শাখার বজরঙ্গ দল প্রমুখ সুব্রত মুখার্জী, অশোক দুবে, ভাস্কর রায়, সীতারাম আর্য, অমল সরকার, অরিন্দম্ কর প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন শরদিন্দু মুখার্জী।

স্বস্তিকার দাম
প্রতি সংখ্যা - ৪.০০ টাকা
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য
সডাক্ - ২০০.০০ টাকা

Ori Plast

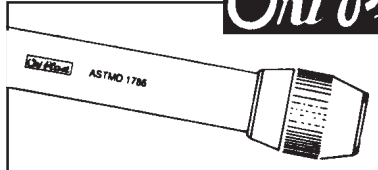

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
15, College Street, Kolkata-700012 Ph : 2241-7149 / 8174

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

চিন্তাশীল মানুষের মনের সঙ্গী
চিন্তাবিদ "শিবপ্রসাদ রায়ের" অসাধারণ রচনাবলীর নতুন সংস্করণ।
প্রকাশকঃ তপন কুমার ঘোষ
অতি সুলভ মূল্যে পাওয়া যাচ্ছে।
প্রাপ্তিস্থান তুহিনা প্রকাশনী
১২সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা - ৭৩
ফোন ঃ ২৩৬০-৪৩০৬, মো ঃ ৯৮৩০৫৩২৮৫৮
সব বুক স্টলকে আকর্ষণীয় হারে কমিশন দেওয়া হয়।

নির্বাচনই সব সমস্যার সমাধান নয়

সোহরাব হাসান

কেমন আছে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের মানুষ। এক কথায় এর সোজা-সাপ্টা উত্তর হল, ভালো নেই। অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে। অর্থনীতির মেরদন্ড ভেঙে পড়ছে, রাজনীতিতে চলছে ফেরেববাজি, ছলচাতুরি। এ ওকে ল্যাং মারা। জোটা ভাঙা, জোট গড়া। ধসে পড়ছে সামাজিক মূল্যবোধ। বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বেড়ে চলেছে লাগামহীনভাবে। সাধারণ মানুষ আয়ের সঙ্গে ব্যয় মেলাতে না পেরে পুরনো সঞ্চ য় ভেঙে খাচ্ছে। যাদের তা-ও নেই, সন্তানদের পড়াশুনা বন্ধ করে দিচ্ছে, আধপেটা খেয়ে কোনরকমে জীবন ধারণ করছে। তারা কেবল রাজনীতি বিমুখ হচ্ছেনা। স্বপ্ন দেখতেও ভুল গেছে। দেশের এই সর্বব্যাপী ও সর্বগ্রাসী সংকট নিয়ে জনদরদী রাজনীতিকদের কোন বক্তব্য নেই। কীভাবে সংকট মোকাবিলা করা যায়, তার কোন কর্মসূচী নেই। তাঁরা ভাবেন নেত্রী মুক্তি পেলে কিংবা নির্বাচন হলেই সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। কীভাবে ঠিক হবে, কারা ঠিক করবেন সে সম্পর্কে তারা একটি কথাও বলছেন না। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ভাবছে, তাদের মেয়াদ শেষ হয়ে আসছে। আর মাত্র সাড়ে পাঁচ মাস বাকি। তারপর মাননীয় উপদেষ্টারাও মাঠ থেকে ফিরে গিয়ে দর্শক গ্যালারিতে বসবেন। প্রধান উপদেষ্টার ভাষ্য অনুযায়ী নতুন বছরের নতুন প্রভাবে নির্বাচিত সরকার দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নেবেন। এখন মাননীয় উপদেষ্টা এবং রাজনীতিকদের কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে, নির্বাচন হওয়া না হওয়াই বাংলাদেশের একমাত্র সমস্যা। নির্বাচন হলেই সারা দেশ আনন্দের জোয়ারে ভাসবে।

নির্বাচনই যদি একমাত্র সমস্যা হবে তাহলে এত অভিযান, ঘেরাও গ্রেপ্তার, তল্লাশি কেন চালানো হল? কেন এত বাঘা বাঘা রাজনীতিকদের পাকড়াও করে রিমান্ডে নিয়ে দিনের পর দিন জিজ্ঞাসাবাদের মহড়া চলল? কেন এত অধ্যাদেশ-আইন জারি হল? কেন এত কমিশন, কমিটি গঠন করা হল? কেন জরুরী অবস্থা জারি করে ১৯ মাস ধরে সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার খর্ব করা হল? কেন কোটি কোটি টাকা খরচ করে দেশ জুড়ে গণতন্ত্রের পক্ষে রোড শো'র আয়োজন করা হল। আমরা গণতন্ত্র চাই। নির্বাচন চাই। তবে নির্বাচনের নামে জনগণের অর্থের অপচয় চাই না। রোড শো'র নামে কোমলমতি শিশু-কিশোরদের হয়রানি চাই না। রোড শো চলাকালে প্রতি জেলার সাদা মনের মানুষের দীর্ঘ তালিকা দেখেছি। ঘটা করে তাদের সংবর্ধনা দিতেও দেখেছি। কিন্তু তাদের কতজন সত্যিকার সাদামনের সে হিসেবটিও জানা দরকার। তবে জনগণের অর্থে পরিচালিত এসব কার্যক্রমে তারা আদৌ লাভবান হয়েছে কি না সে প্রশ্নের জবাব দিতে হবে সরকারকেই।

গরীব বাংলাদেশের মানুষের পক্ষে গণতন্ত্র ও নির্বাচনের নামে এই মহাযজ্ঞ ও মহড়া মেনে নেওয়া যায় না। গণতান্ত্রিক দেশে নির্বাচন, সংসদ, সরকার — এসবই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। বাংলাদেশে সরকার বিদায় নেয় অস্বাভাবিক পথে, আবার নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হয় অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়। যেমন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাটিই একটি অস্বাভাবিক প্রক্রিয়া। যেমন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে জরুরি অবস্থা জারিও একটি অস্বাভাবিক প্রক্রিয়া, পৃথিবীর সব গণতান্ত্রিক দেশেই সংসদ ভেঙে যাওয়ার পর নির্বাচিত সরকারই অন্তবর্তী সরকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। নির্বাচন করার মালিক সরকার নয়, নির্বাচন কমিশন। বাংলাদেশে বর্তমান নির্বাচন কমিশন নিজেকে স্বাধীন দাবি করলেও স্বীকার করেছে, তারা সরকারের ইচ্ছেতেই স্থানীয় সরকার তথা উপজেলা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়েছে। সরকার না চাইলে তারা করতেন না। সে ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সরকারের আমলে গঠিত নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে তাদের পার্থক্য কি হল? আওয়ামী লীগ, বি এন পি শাসনামলে নির্বাচন কমিশন উপজেলা নির্বাচন করতে পারেনি বা করেনি তৎকালীন সরকারের অনাগ্রহরে কারণেই। এখানে নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব কোন কর্তৃত্ব বা এক্তিয়ার নেই। তাহলে স্বাধীন নির্বাচন

খালেদা জিয়া

কমিশনের কথা বলা কেন?

নির্বাচন সংক্রান্ত সব সিদ্ধান্ত নেবে নির্বাচন কমিশন নিজের বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী। কারও অঙ্গুলি হেলনে নয়। যে কাজটি ভারতের ও দক্ষিণ আফ্রিকার নির্বাচন কমিশন করেছে। সরকারের চাওয়া পাওয়ার সঙ্গে তাদের কাজের কোন সম্পর্ক নেই। তাদের কাজের সম্পর্ক থাকবে নির্বাচনী আইন ও রাজনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে। যুক্তির খাতিরে যদি ধরে নিই রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত অগ্রাহ্য করে নির্বাচন কমিশন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে অরাজনৈতিক উপজেলা নির্বাচন করে ফেলে, সেই এক্তিয়ার তাদের আছে। তাতে দুটি সমস্যা দেখা দিতে পারে। এক) পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল অংশ নাও নিতে পারে। বি এন পি তথা চারদলীয় জোট ইতিমধ্যে জানিয়ে দিয়েছে, খালেদা জিয়ার মুক্তি ছাড়া তারা কোন আলোচনায় যাবে না, নির্বাচনও করবে না। আওয়ামী লীগও বলেছে, সংসদ নির্বাচনের আগে উপজেলা নির্বাচন করা যাবে না। তাহলে কি প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলকে বাদ দিয়েই জাতীয় সংসদ ও উপজেলা নির্বাচন হবে? ২২ জানুয়ারীর একতরফা নির্বাচন বাতিল করতেই ১/১১-এর সৃষ্টি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষমতারোহণ। নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন সহ বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। ১/১১-এর আগে যেরকম পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল সেরকম পরিস্থিতি কাম্য নয়। নির্বাচন কমিশন ও সিভিল সোসইটি যুক্তি দেখাচ্ছে যে, উপজেলা নির্বাচন আগে না করলে রাজনৈতিক সরকার ক্ষমতায় এসে নাও করতে পারে। গত পনের বছরে তারা উপজেলা নির্বাচন করেনি। নির্বাচন কমিশন ও সিভিল সোসাইটির সঙ্গে সমাজের সাধারণ মানুষের সম্পর্ক এতই ক্ষীণ যে, তারা তাদের চাওয়া-পাওয়াটি বুঝতে অক্ষম। তারা মনে করেন, যেনতেনভাবে উপজেলা নির্বাচন হয়ে গেলেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজ নববই ভাগ সম্পন্ন হবে। গণতন্ত্র কোন বিচ্ছিন্ন নির্বাচন নয়। একটি সামগ্রিক ব্যবস্থা। আগে লিখেছিলাম, স্থানীয় সরকার সর্বরোগহারী কোন বটিকা নয়। জাতীয় সংসদে খারাপ লোকেরা নির্বাচিত

ফকরুদ্দিন

হয়ে এলে উপজেলা বা সিটি কর্পোরেশনে ফেরেস্তা আসার কোন সম্ভাবনা নেই। আসলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন

"বি এন পি তথা চারদলীয় জোট ইতিমধ্যে জানিয়ে দিয়েছে, খালেদা জিয়ার মুক্তি ছাড়া তারা কোন আলোচনায় যাবে না, নির্বাচনও করবে না। আওয়ামী লীগও বলেছে, সংসদ নির্বাচনের আগে উপজেলা নির্বাচন করা যাবে না। তাহলে কি প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলকে বাদ দিয়েই জাতীয় সংসদ ও উপজেলা নির্বাচন হবে?"

কমিশন সবকিছু একসঙ্গে করতে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে। এখন দ্রুত দৃশ্যপট পাল্টাতে চাইছে। তারা যে কাজটি করতে পারতেন তা হল রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন আনার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি। সেই লক্ষ্যে তারা কিছু কিছু পদক্ষে পও নিয়েছিলেন। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংস্কারের তোড়জোড় শুরু হয়েছিল। তারপর কোত্থেকে কি হল হঠাৎ একদিন রাজনৈতিক কর্মকান্ডই বন্ধ করে দেওয়া হল। রাজনীতি নিষিদ্ধ রেখে রাজনৈতিক সংস্কার। প্রথমে জরুরী অবস্থার মধ্যে তথাকথিত কিংস পার্টি গঠিত হল। সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রীর নাম নিয়ে নানা জল্পনা চলতে থাকল। ফলে সংস্কারের উদ্যোগটিও মাঠে মারা গেল। ১৯ মাস পর দেখা গেল দেশ যেখানে ছিল সেখানেই আছে। দুর্নীতির মামলা থেকে রাঘব বোয়ালরা ছাড়া পাচ্ছেন। আগে হাইকোর্টের আদেশ আপিল বিভাগে বাতিল হতো। এখন বহাল থাকছে। টি আই বি-র রিপোর্ট অনুযায়ী তৃণমূল পর্যায়ে দুর্নীতি কমেনি। আমলাতন্ত্র সদর্পে বহাল আছে। প্রশাসনে সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার নেই।

তবে যে খবরটি আমাদের আশান্বিত করে তা হলো, বর্তমান নির্বাচন কমিশন বিলম্বে হলেও একটি নির্ভুল ভোটার তালিকা জনগণকে উপহার দিতে যাচ্ছে। নির্বাচনের জন্য জরুরীও। এই একটি কারণে বর্তমান নির্বাচন কমিশন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ধন্যবাদ পেতে পারেন। তারা এম এ আজিজের ভুয়া ভোটার তালিকাটি বাতিল করেছেন। সর্বশেষ তথ্যে জানা গেছে, আগের তালিকার চেয়ে এক কোটি ভোটার কম নিবন্ধিত হয়েছে। অর্থাৎ এমএ আজিজ-মাহফুজ চক্র এক কোটি ভুয়া ভোটার দাঁড় করিয়েছিল। অন্যান্য অপকর্মের কথা বাদ দিলেও এই একটি অপরাধের জন্য তাদের বিচার হওয়া উচিত।

সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় সংসদ নির্বাচন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিদায় নেবে। কিন্তু নির্বাচন কমিশন এসেছে পাঁচ বছরের জন্য। পাঁচ বছর যাতে তারা সুষ্ঠু ও স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন সেই চেষ্টাই করতে হবে। জনগণ এম এ আজিজের বাজার বন্ধ করে দিয়েছিল। ভবিষ্যতে যাতে কারও জল বন্ধ না হয় সে বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। বাংলাদেশের মানুষ হৃদয়ের

শেখ হাসিনা

উষ্ণতা দিয়ে যেমন ক্ষমতাসীন ও পদাধিকারীদের বরণ করে নিতে জানে তেমনি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যানও করতে পারে। এ কথাটি শুধু নির্বাচন কমিশন নয়, সরকারের উপদেষ্টা তথা রাজনৈতিক দলের নেতাদেরও অনুধাবন করতে হবে। আজ যারা ঘুষ-দুর্নীতি, চাঁদাবাজির মামলায় জেলখানায় আছেন, একদিন জনগণই তাদের বিপুল ভোটে নির্বাচিত করেছিল। বাংলাদেশে জেলখানা ও প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারের ব্যবধান খুবই সামান্য।

লেখাটি শুরু করেছিলাম দেশের অবস্থা নিয়ে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার সুচারুভাবে দেশ পরিচালনা করছে, সর্বক্ষেত্রে সফল হয়েছে সেসব দাবি কেউ করবে না। অর্থ উপদেষ্টা মির্জা আজিজুল ইসলাম বলেছেন, দ্রব্যমূল্যের ঊর্দ্ধগতি সরকারের সব অগ্রগতি ম্লান করে দিয়েছে। তবে এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার আর কিছু না পারলেও রাজনীতিতে একটি বড় ধরনের ধাক্কা দিয়েছে। তারা বেশ কিছু ভালো পদক্ষেপ নিয়েছে, নিজেদের ভুলগুলো সংশোধনের চেষ্টা করছে। উপদেষ্টা পরিষদের প্রায় অর্ধেক সদস্যকে বাদ দেওয়াই তার প্রমাণ। জোট আমলে মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে এত অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও তাদের বাদ দেওয়া হয়নি, কেউ কেউ প্রমোশনও পেয়েছেন।

আগে যেই চিন্তাই থাকুক না কেন, এখন মনে হচ্ছে ৩১ ডিসেম্বরের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় থাকতে চাইছে না। সে ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতৃত্বই ফেল চালকের আসনে বসবে। কিন্তু কিভাবে তারা দেশ চালাবেন? তাদের আর্থিক নীতি কি হবে? শিক্ষা বা বাণিজ্য নীতি কি হবে? কৃষিতে কতখানি ভর্তুকি দেবেন? বেকার সমস্যা দূর করতে কি কর্মসূচী নেবেন সে সম্পর্কে কারও মাথাব্যথা নেই। তারা হয়তো যুক্তি দেখাবেন রাজনীতি উপযুক্ত নয়। সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ। এ অবস্থায় তারা মত প্রকাশ করবেন কিভাবে? কেন? ঘরোয়া রাজনীতির সুযোগে তো প্রায় প্রতিদিনই তারা দলীয় অফিসে, বাড়ির ড্রয়িং রুমে ও কমিউনিটি সেন্টারে বসে সভা করছেন, বক্তৃতা দিচ্ছেন, আটক নেতা -মন্ত্রীদের মুক্তির দাবি করছেন, সরকারের ব্যর্থতার সমালোচনা করছেন। কিন্তু অর্থনৈতিক দূরবস্থা নিয়ে, দ্রব্যমূল্যের ঊর্দ্ধগতি নিয়ে রুটিনমাফিক বিবৃতির বাইরে একটি কথাও বলছেন না। নেত্রীদের মুক্তির দাবিতে জরুরী আইন ভঙ্গ করে সাব-জেলের সামনে নেতা-নেত্রীরা মানববন্ধন করছেন। প্রতীকী গণ-অনশন পালন করলেও মানুষের হাত কাজ ও পেটে ভাত দেওয়ার দাবিতে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার মতো একটি সমাবেশও করেননি তারা। নির্বাচন করে যারা ক্ষমতায় যেতে প্রত্যাশী তারাও যেন চুপচাপ আছেন। যারা ভাবছেন কোনওদিন নির্বাচনে যেতে পারবেন না, তারাও। অতীতে রাজনীতিকরা ক্ষমতাসীনদের মুন্ডুপাত করে, বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনগণের ভোট আদায় করেছেন। এখনও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কঠোর সমালোচনা করছেন। কিন্তু নিজেরা কি করবেন তা বলছেন না। তারা এও বলছেন না, দলের দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসীদের গডফাদারদের বহিষ্কার করা হবে।

তাহলে কি আমরা ১/১১-এর পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবো? আবার সংঘাত সংঘর্ষ অবরোধ ও বয়কটের রাজনীতি? আবার বিরোধী দলের সমাবেশে বোমা হামলা চালিয়ে মানুষ হত্যা? আবার দুর্নীতিবাজ মন্ত্রী, এম পি-দের দৌরাত্ম্য চলবে? আবার হত্যা মামলা চাপা দিতে ২১ কোটি টাকা ঘুষ লেনদেন? এসব কথা ভাবতেই গা শিউরে উঠে?

(সৌজন্যে ঃ দৈনিক সংবাদ)

Best Wishes From :~

WESTING HOUSE SAXBY FARMER LTD.

17, CONVENT Rd.
Kolkata - 700014

ভারত ভাগের দায় গান্ধীজীর ওপর চাপাবার চেষ্টা

ডঃ দীনেশ চন্দ্র সিংহ

কিছুদিন আগে গান্ধীজীর পৌত্র রাজমোহন গান্ধীর লেখা "মোহনদাস : এ ট্রু স্টোরি অফ এ ম্যান, হিজ পীপল অ্যাণ্ড অ্যান এম্পায়ার (Mohandas : A true story of a Man, His People and an Empire") নামে প্রকাশিত একখানি গ্রন্থের শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় "দেশ" পত্রিকায় তার এক যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা করেন। তাতে তৎকালীন মুসলিম রাজনীতি ও নেতাদের সম্পর্কে কিছু অপ্রিয় সত্য মন্তব্য ছিল —যা বর্তমান কালের মুসলিম লেখক ও সেকুলারি হিন্দুদের পক্ষে হজম করা শক্ত। ইদানীং মুসলমান সমাজে আমিনুল ইসলাম নামে এক ভুঁইফোঁড় লেখকের আবির্ভাব ঘটেছে— তথ্য বিকৃতি ও মনগড়া ইতিহাস রচনায় ইনি সিদ্ধ হস্ত।

শৈলেশবাবু কৃত সমালোচনার উপর আমিনুল ইসলাম "স্ব-বিরোধী গাঁধি চরিত্র' পত্রে অনেক অবান্তর ও বেমক্কা উক্তি করেছেন : কিন্তু মুসলিম লীগের "লড়কে লেঙ্গে, মারকে লেঙ্গে", রাজনীতি ও হিন্দু-হত্যাকারী প্রত্যক্ষ সংগ্রাম যে দেশভাগের কারণ সেকথা সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। শৈলেশবাবুও "বিভাজনে সম্পত্তি কার স্বার্থে" শীর্ষক জবাবী পত্রে তার উল্লেখ করেননি। অহিংসাবাদী কিনা, হত্যা ও রক্তের উল্লেখেই এঁরা ভিরমি খান। কিন্তু এতে যে অসত্য সত্যের মর্যাদা পায়, মিথ্যার আবরণে সত্য চাপা পড়ে, সেকথা ভেবে দেখেন না! এবার সেসব পুরনো ইতিহাস একটু ঝালিয়ে নেওয়া যাক।

আমিনুল ইসলামের মতে গান্ধীজীর ধর্মভিত্তিক রাজনীতি তৎকালীন ভারতে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভবে নাকি বিশেষ ইন্ধন জুগিয়েছিল। এর চেয়ে ডাহা মিথ্যা আর কি হতে পারে? এদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির বীজ পুঁতেছিলেন আলিগড় খ্যাত স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ভারতবাসীর একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান "Indian Nationall Congress" প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি সেই কংগ্রেসে যোগদান করতে অস্বীকার করেন। কারণ, ভারতে শুধু একটি "Nation" নয়, একাধিক "Nation" আছে। ফলে কংগ্রেস দল কোনো মতেই "National" হতে পারে না। এবং মুসলমান হয়ে তিনি তাতে যোগ দিতে পারেন না। দ্বিজাতিতত্ত্বের বীজ পুঁতল কে? ব্রিটিশ না সৈয়দ আহমেদ?

তার ২০ বছর পর প্রথম ধর্মীয়-রাজনৈতিক দল হিসাবে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা। জন্ম লগ্ন থেকেই তাঁর পৃথক পথ চলা শুরু। তারা মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের দাবী তুলল এবং অচিরে তা আদায় করে নিল। পৃথক দল হল; পৃথক নির্বাচন হল। গান্ধীর রাজনীতিতে আসার আগেই এবার পৃথক হোমল্যাণ্ডের দাবি। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুপ্রদেশ, সীমান্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও বালুচিস্তানের মতো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চ ল নিয়ে মুসলমানদের জন্য আলাদা হোমল্যান্ডের দাবি তুললেন মুসলিম লীগ নেতা কবি ইকবাল। অতঃপর ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে উপরোক্ত অঞ্চ লগুলির সঙ্গে বাংলা ও অসমকে যোগ করে লাহোরে লীগ দলের অধিবেশনে সরাসরি দেশ ভাগের দাবী তুলল

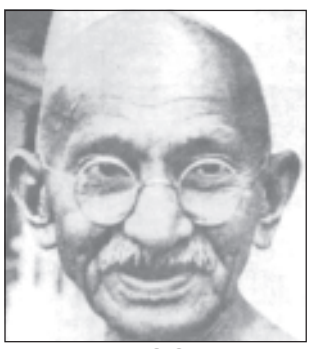

গান্ধীজী

জিন্নার নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ। তা হলে ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে ইন্ধন জোগালেন কে? গান্ধী না জিন্না? খিলাফত আর অসহযোগ আন্দোলনের গাঁটছাড়ার ফল দেশের পক্ষে আদৌ সুখকর হয়নি। কারণ খিলাফত ছিল ধর্মাশ্রিত আন্দোলন, আর অসহযোগ ছিল ধর্ম-নিরপেক্ষ আন্দোলন। এই হাঁস-জারু আন্দোলন যে ব্যর্থ হবে তা বিজ্ঞ-ব্যক্তিরা আগেই বলেছিলেন। হিন্দুরা যেখানে গলা ছেড়ে "আল্লা-হু-আকবর হেঁকেছে, মুসলমানরা মিউমিউ করে বন্দেমাতরম্ বলেছে কি বলেনি। অথচ এই ব্যর্থ আন্দোলনের গুণাগার দিতে হয়েছে মালাবারের হিন্দুদের।

গাঁধী নিজেকে বেদ-পুরাণের ঘোরতর বিশ্বাসী, গো-মাতার রক্ষক ও একনিষ্ঠ পূজারী, মূর্তিপূজারী, সর্বপ্রথম হিন্দু তারপর দেশপ্রেমিক বলে থাকলে অপর সম্প্রদায়ের আপত্তির কি কারণ থাকতে পারে? তিনি তো অপর সম্প্রদায়ের মসজিদ ভাঙতে যাননি, মসজিদে শূওরের মাংস ফেলতে যাননি, অপর সম্প্রদায়ের মেয়েদের উপর অত্যাচার করতে বলেননি, অপর সম্প্রদায়কে হত্যা করতে উস্কানি দেননি—তা হলে তিনি দেশীয় রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতার অনুপ্রবেশ ঘটালেন কী ভাবে?

গাঁধীর ধর্মকেন্দ্রিক রাজনীতির সাফল্য দেখেই জিন্না নাকি দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী হয়ে পড়েন। এ আবার কেমন কথা! গান্ধী স্বধর্মে নিষ্ঠাবান থেকেও যেমন ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন, জিন্না তার এক-দশমাংশ ধর্মনিরপেক্ষ হলে ভারতবাসী জোড়া মহাত্মা পেত। তারা একই সঙ্গে মহাত্মা-মহাত্মা জিন্না বলে জয়ধ্বনি দিত। কিন্তু জিন্না হিংসাশ্রয়ী রাজনীতি নিয়ে

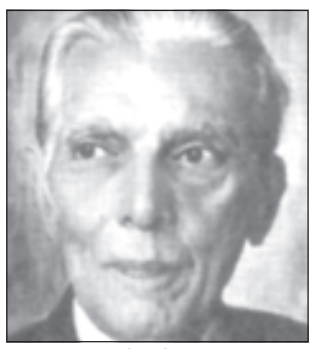

মিঃ জিন্না

অহিংস রাজনীতির সঙ্গে লড়তে গেলেন এবং জয়লাভ করলেন।

আমিনুল ইসলাম ভারত ভাগের সব দায়িত্ব গান্ধী ও কংগ্রেস নেতাদের উপর চাপিয়েছেন। আর দেশ খণ্ডীকরণের জন্য যারা লাহোর-প্রস্তাব থেকে শুরু করে কলকাতা-নোয়াখালিতে "ডাইরেক্ট অ্যাকশন" চালিয়ে শতসহস্র নিরপরাধ নরনারীর রক্তে হাত রঞ্জিত করেছে, তাদের হাত ধুয়ে সাফ্ করলেন! এটা কি রকম ইনসাফ্? একে সচেতন বদমাইশি ছাড়া আর কি বলা যায়?

তিনি আরো লিখেছেন, কংগ্রেসীরা না কি বলেছে গান্ধীজি চাইলে তারা আবারও সংগ্রাম করত। কিন্তু সংগ্রাম কার বিরুদ্ধে? ব্রিটিশ সরকার তো বলেছে-আমরা যেতে প্রস্তুত, তোমরা হিন্দু-মুসলমান বুঝে পড়ে নাও। হিন্দুরা বৃটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে করে ক্লান্ত। সেই ক্লান্ত হিন্দুদের উপর দেশভাগ করে পাকিস্তান কায়েম করতে জিন্নার নেতৃত্বে মুসলমানরা ঝাঁপিয়ে পড়ল, এবং অগণিত নির্দোষ নর-নারীর দেহ খণ্ডবিখণ্ড হল। সুতরাং আরো অধিক সংখ্যক নরনারী শিশুর দেহ খণ্ডীকরণ ঠেকাতে হিন্দু নেতারা দেশ খণ্ডী-করণে রাজী হল। কারণ, জিন্না তো লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে বলেই দিয়েছেন — ...no other solution except full Pakistan could possibly bring peace to India, since anything less would be. Sure to produce further strife and bloodshed."

মাউন্টব্যাটেন যখন জিন্নাকে দেশভাগের প্রতিকূল পরিণতির কথা বোঝাচ্ছিলেন তখনও জিন্না জেদের সঙ্গে জবাব দিলেন— "You must carry out a surgical operation" মাউন্টব্যাটেন যখন বললেন, সার্জিক্যাল অপারেশন করতে হলে তো দেশভাগের সঙ্গে প্রদেশ ভাগও করতে হবে, তখন হতাশ জিন্না বলতে বাধ্য হলেন — I do not care how little you give me as long as you give it to me completely."

ভাঙ্গা হোক, পোকাকাটা হোক, যক্ষ্মারোগগ্রস্ত জিন্নার যে তখন পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল হিসেবে এন্তেকালের খুবই সখ! হিন্দুদের উপর অকারণ অমূলক দোষ চাপিয়ে পার পাবেন না আমিনুল ইসলাম সাহেব!

তবে সত্যকে চাপা দিয়ে অসত্যের জয়গান করতে গেলে প্রাকৃতিক নিয়মেই যেন বৃহত্তর অপ্রিয় সত্যের দরজা খুলে দেওয়া হয়। আমিনুল ইসলামের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। তিনি অপ্রাসঙ্গিকভাবে এলমাহার্স্ট-এর দলিল থেকে গান্ধী -রবীন্দ্রনাথের আলোচনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নাকি বলেছেন — "মুসলমান সম্পর্কে বিদ্বেষের বিষ কি আপনি সেখান থেকে (হিন্দুদের মন থেকে) সম্পূর্ণ নির্বাসিত করতে পেরেছেন?"

এই প্রশ্নের জবাব গান্ধী কেন, রবীন্দ্রনাথ নিজেই কি দিতে পারতেন? কারণ এর জবাব অতীব নিষ্ঠুর, অতীব ঘৃণ্য, অতীব অমানবিক, অতীব বেদনাদায়ক। এর জবাব দিতে গেলে ইসলাম ধর্মের উৎপত্তি ও ভারতে প্রবেশের কথা সংক্ষেপে বলতে হয়।

ইসলাম ধর্ম প্রবর্তনের পূর্বে আরব, ইরাক, পারস্য (ইরান), গান্ধার (আফগানিস্তান) ইত্যাদি দেশের সঙ্গে সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল। এসব দেশের সভ্যতা সংস্কৃতি ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির মতোই অতি প্রাচীন ও বহুমুখী। কিন্তু ইসলাম ধর্মের আগ্রাসী নীতি হল কোরান মানো, না হয় কৃপাণে মারো — এসব দেশের সভ্যতা সংস্কৃতি ধ্বংস করে। এসব দেশের মানুষের মনের সুকুমার প্রবৃত্তিগুলিকে বিনষ্ট করে দেয়। এসব দেশ থেকে যুগ যুগ ধরে দলে দলে লোক জ্ঞানবিজ্ঞানের অন্বেষণে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনে তীর্থক্ষেত্র পরিদর্শনে আসা যাওয়া করত। ভারত থেকেও অনুরূপ কারণে ভারতবাসীরা ঐসব দেশে যাতায়াত করত। আরবের লোকেরা ছিল মূর্তি পূজক, মক্কার মক্কেশ্বর শিব ছিল তাদের উপাস্য দেবতা। ইরান বা পারস্যের লোকজন ছিল অগ্নি উপাসক আর গান্ধার বা আফগানিস্তান ছিল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী দেশ। কিন্তু অতি অল্পকাল মধ্যে ইসলামী হিংস্রতার তাণ্ডবে এই তিনটি সুপ্রাচীন সভ্যতার বিনাশ ঘটে। কত নিরপরাধ নরনারীর রক্তস্রোতে এসব দেশ প্লাবিত হয়েছিল, তার কোনও ইতিহাস নেই; তবে নিজেদের ধর্ম সংস্কৃতি বিসর্জন দিয়ে তারা যে জীবন রক্ষা করেছিল তা তাদের প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসপ্রাপ্ত নিদর্শন থেকে অনুমান করা যায়। পারস্য বা ইরান থেকে অতি স্বল্প সংখ্যক ইরানী পালিয়ে এসে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। সেই জরথুস্ত্র মতাবলম্বী অগ্নি-উপাসক পার্শীগণই বর্তমান ইরানের আদি অধিবাসীদের নিদর্শন হিসেবে বেঁচে বা টিকে আছে।

ইরাক ইরান আফগানিস্তান পদদলিত ও ধর্মান্তরিত করার পর পরধর্ম বিদ্বেষী ও একেশ্বরবাদী মুসলমানদের দৃষ্টি পড়ল এবার ভারতবর্ষের হিন্দুদের উপর। বিধর্মীদের ধর, কোতল কর;আর যদি মুসলমান হতে রাজী হয়, তাহলে কলমা পড়াও, সুন্নত করাও। সহজে রাজী না হলে সম্পত্তি লুঠ কর, বাড়িঘর পোড়াও মেয়েগুলিকে কেড়ে নাও, পুরুষগুলিকে জ্যান্ত পোড়াও—এ সবই পরম দয়াময় খোদাতালার নির্দেশ এতে কোনও গুনাহ্ (পাপ) হয় না। পবিত্র কোরানে তাই লেখা আছে।

সন্ত্রাস ঃ আমেদাবাদে বোমা বিস্ফোরণে

প্রাচীনকালে বিভিন্ন কার্যোপলক্ষে আরববাসীদের এদেশে অবাধ যাতায়াত ছিল। তার ফলে এদেশীয়দের ধর্মীয় আচরণ, সামাজিক প্রথা সম্পর্কে তারা যথেষ্ট

(এরপর ১১ পাতায়)

"

রবীন্দ্রনাথ, সুদূর অতীতের কথা বাদ থাক, তাঁর জীবদ্দশাতেই সারা ভারতের কথা দূরে থাক, সোনার বাংলার বুকেই ইসলাম ধর্ম ও তার অনুসারীদের এই বীভৎস রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন বলেই স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, শত শত বৎসর ধরে নির্মম অত্যাচারের শিকার হিন্দুদের মনে মুসলমান সম্পর্কে যে বিদ্বেষের বিষ সঞ্চি ত হয়েছে তা নির্বাসিত করার ক্ষমতা গাঁধীজির নেই।

"

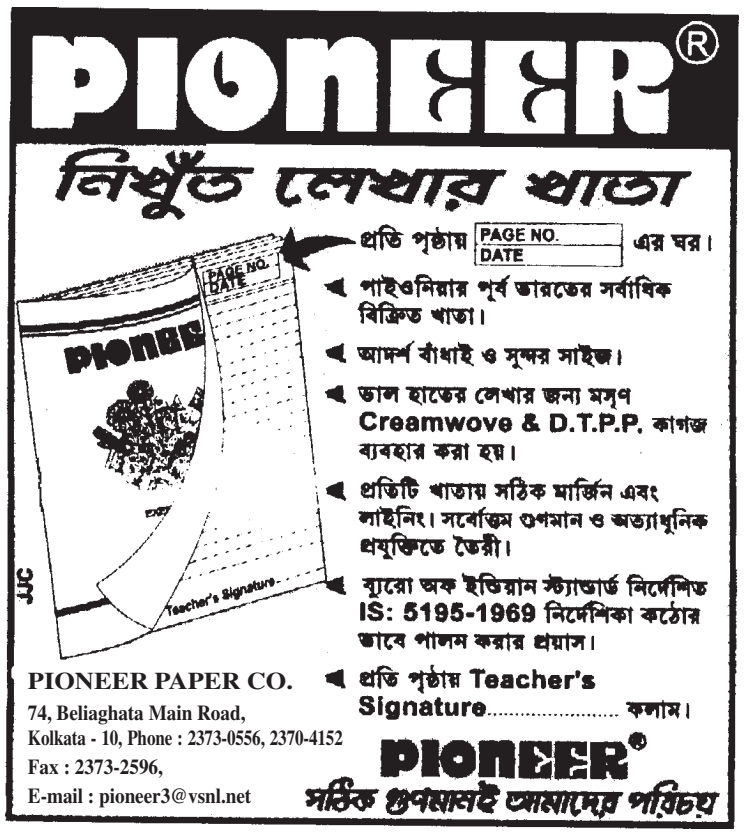

দুর্নীতি ঃ সংসদে ঘুষকাণ্ড।

> “আমরা সাধারণ ভারতবাসীরা আসুন নিজ নিজ এলাকায় নিজেদের সুরক্ষার জন্য নিজেরাই কঠোর নজরদারির ব্যবস্থা করি। এটাই এ বছরের স্বাধীনতা দিবসের সঙ্কল্প।”

জাতপাত ঃ সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলন।

২০০৮-এর স্বাধীনতা দিবস

ভারতবাসী কি সংকল্প গ্রহণ করবে ?

মেঃ জেঃ কে কে গঙ্গোপাধ্যায়

মাত্র তিন দিন আগেই ভারত ৬২ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করল। এই খন্ডিত স্বাধীনতা মাত্র দু'শ বছরের গোলামীর অথবা এক হাজার বছরের মুঘলদের গোলামী থেকে মুক্তি (!) সে প্রশ্ন অবান্তর। কিন্তু এই স্বাধীনতা ভারত ভূখন্ডকে দ্বিখন্ডিত করেছে। কারণ মুসলমান সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ নিজেদের ভারতবাসী বলে পরিচয় দিতে চাননি। বরং মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গড়ে প্রমাণ করে দিতে চেয়েছিলেন, সেই স্বতন্ত্র রাষ্ট্র উন্নতি, প্রগতির কোন সোপানে পৌঁছে যেতে পারে, সারা বিশ্বে শান্তি ও সমৃদ্ধি র এক অনুপম ক্ষেত্রে পরিণত হতে পারে। ভারত স্বাধীন হল, পাকিস্তান নামক নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হল। কিন্তু শান্তি? পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই ভারত উপমহাদেশের অশান্তির দাবানল প্রজ্জ্বলিত হল। সে আগুন আজও দাউ দাউ করে জ্বলছে। কারণ পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ এবং পররাষ্ট্র নীতির একটাই উপাদান, ভারত বিদ্বেষ। ভারতের সঙ্গে শত্রুতা। কী ভাবে ভারতের ক্ষতি করা যায়, বিশ্বের দরবারে ভারতকে হেয় করা যায়। অজুহাত জম্মু-কাশ্মীরের মালিকানা। ইনডিপেনডেন্স অফ ইন্ডিয়া এ্যাক্ট এবং ডানকান কমিশনের ফরমুলা অনুসারে যে মুহূর্তে মহারাজ হরি সিং ভারতে অন্তর্ভুক্তির সনদে স্বাক্ষর করেছেন, জম্মু-কাশ্মীর ভারতের অঙ্গীভূতও হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বৃটিশ শক্তির চক্রান্তে তা বাস্তবে রূপায়ণ করা সম্ভব হয়নি। যে শান্তির অজুহাতে অবিভক্ত ভারতের হিন্দু, মুসলমানসহ সমস্ত সম্প্রদায়ের কোটি কোটি মানুষের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভারত খন্ডিত স্বাধীনতা পেল, তা ৬২ বছর পরও সুদূর পরাহত। বরং ধর্মান্ধ ইসলামিক রাষ্ট্রের চক্রান্তে উভয় ভূ-খন্ডই অশান্ত, অস্থির, নিরপরাধ মানুষের উষ্ণ রক্তে অবগাহন করে চলেছে। পাকিস্তান যেমন এই অবস্থার জন্য দায়ী, তেমনই দায়ী ভারতের কিছু মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ। আবার পাকিস্তান দ্বিখন্ডিত হয়ে বাংলাদেশ নামক যে নতুন রাষ্ট্র জন্মগ্রহণ করেছে, যার জন্ম যন্ত্রণায় ভারতের বহু সৈনিক প্রাণ দিয়ে শহীদ হয়েছেন, সেই রাষ্ট্রও কৃতজ্ঞতা ভুলে ভারতের মানুষের যন্ত্রণার কারণ হয়েছে। আর পাকিস্তান! স্বর্গ রাজ্যের পরিবর্তে সন্ত্রাসবাদী, জেহাদী, বিফল রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে রয়েছে।

তাহলে ১৯৪৭-এর সেই খন্ডিত স্বাধীনতায় কি সুফল লাভ হল? ভারতবাসী আশা করেছিল, প্রতিদিনের সেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার হাত থেকে অন্তত ভারতবাসী নিস্কৃতি পাবে। আলাদা ভূখন্ড নিয়ে তারা সুখে থাক, প্রগতি করুক। উন্নতি করুক, অন্তত একটি সু-প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে উঠুক। ৬২ বছর পর মনে হচ্ছে সবই যেন বৃথা হয়ে গিয়েছে। কোটি কোটি হিন্দু পাকিস্তানে ধর্মান্ধ মানুষের হাতে বলি হয়েছেন। কোটি কোটি মানুষ নিজেদের সর্বস্ব খুইয়ে স্ত্রী, কন্যা, ভগিনীর উপর পাশবিক অত্যাচারের সাক্ষী হয়ে ভারতে কপর্দক-শূন্য অবস্থায় শরণার্থী হয়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। আজও তাঁরা ছিন্নমূল, পায়ের নীচে মাটির তল্লাসী। আর যাঁরা এ রাষ্ট্র ত্যাগ করে সেই নবগঠিত ভূ-স্বর্গের সন্ধানে গিয়েছিলেন আজও তাঁরা মোহাজির — রাষ্ট্রের মূলধারায় স্থান পাননি। অনেকেই আবার এদেশে আশাহত হয়ে ফিরে এসেছেন। ভারতবাসী ভেবেছিলেন, রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাওয়া গিয়েছে, ধীরে ধীরে আর্থ-সামাজিক স্বাধীনতা নিশ্চ য়ই আসবে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা সত্যিই এসেছিল। ভারত আজ বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। “মুক্তির মন্দির সোপানতলে কত প্রাণ হল বলিদান/ লেখা আছে অশ্রুজলে/ যাঁরা স্বর্গগত তাঁরা এখনো জানে/ স্বর্গের চেয়ে প্রিয় জন্মভূমি”। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামী যাঁরা শহীদ হননি, স্বাধীন ভারতের ভিত্তি স্থাপনে তাঁরা ওই মন্ত্রেই কাজ করে গিয়েছেন।

তাঁরা সকলেই একে একে মহাপ্রস্থানের পথে রওনা হওয়ার পর আজ কি দেখছি? কেউ বলছেন বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস, কেউ আনছেন নোটের বান্ডিল! অর্থ-ই ক্ষমতা লাভের সহজ উপায়, আরও অনেকে দেখাচ্ছেন পেশী শক্তি। ক্ষমতার অলিন্দে প্রবেশ নিরঙ্কুশ দেশসেবা-জনসেবা নয়। ভোগ-লালসা এবং সীমাহীন অর্থলাভের সোপান মাত্র। কোথায় গেল সেই সর্দার প্যাটেল, জওহরলাল, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী, শ্যামাপ্রসাদ, হীরেন মুখার্জ্জী, বিধান রায়, বিনোবা ভাবে, ইন্দিরা, জয়প্রকাশ যাঁদের দেশপ্রেম, নিষ্ঠা, মেধা, দূরদর্শিতা, বাগ্মীতা রাষ্ট্রকে প্রগতির পথে পরিচালনা করেছিল? আজ রাজনীতি পররাষ্ট্র নীতি জাত-পাত, ধর্ম আঞ্চ লিক স্বার্থ, ব্যক্তিগত-দলগত - লাভ-লোকসান এবং ইজমের দ্বারা পরিচালিত। গুণবত্তা নয় শুধুমাত্র সংখ্যাধিক্যতার জোরেই রাজনীতি পরিচালিত।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পি এল ৪৮০-র অবস্থা বহু পিছনে ফেলে ভারতের অগ্রগতি হয়েছে। খাদ্যে ভারত স্বয়ংভর। শিল্প-বাণিজ্যের-নেতারা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে-বলিষ্ঠ পদক্ষেপ রেখেছেন। ভারতের বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিবিদরা আর একবার প্রমাণ করেছেন জগদীশ চন্দ্র বোস, প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, হোমি ভাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করে নতুন প্রজন্ম পিছিয়ে নেই। ভারত আজ স্বক্ষমতায় পরমাণু অস্ত্রধর রাষ্ট্র, মহাকাশে উপগ্রহ প্রেরণে তারাও সক্ষম। অর্থনৈতিক উদারিকরণের সুযোগ নিয়ে তথ্য প্রযুক্তিতে ভারত এখন মহাশক্তি। কিন্তু সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভারত ক্রমাগত অবক্ষয়ের শিকার। একদিকে নিরক্ষরতার হার প্রয় ৫০ শতাংশ, অন্যদিকে দারিদ্র্য দূরীকরণে আজও ভারত ব্যর্থ। দারিদ্র্য সীমার নীচে আজও ভারতের ৩৮ শতাংশ মানুষ, যাদের দৈনিক গড় আয় মাত্র ২০ টাকা। শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ভারতের স্থান বিশ্বমানের বহু নিম্নে। যে অনগ্রসর শ্রেণীর উন্নতি কল্পে শিক্ষা ও কর্মসংস্থাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেই সুযোগ এবং সুবিধা জাতি, উপজাতি অর্থাৎ প্রকৃত অনগ্রসর সম্প্রদায়ের মানুষ পায়নি। সমস্ত সুবিধা কুক্ষিগত করেছেন শহরবাসী এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছের মানুষ এবং দলগত ঝান্ডাবাহীদের একাংশ। বামপন্থীরা সাম্যবাদের পূজারী। দলিত, পীড়িত, কৃষক, মজুরদের ত্রাণকর্তা। কিন্তু এইসব দরিদ্র শোষিত মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি বিধান যখন সম্ভব হয়নি তাঁদের প্রয়াস মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্তদের টেনে নামিয়ে দারিদ্রের সাম্য প্রতিষ্ঠা করা। কাঁকড়া মানসিকতা।

এই জাত-পাতের ভিত্তিতে সংরক্ষণ নীতি রাষ্ট্রের একতা বিঘ্নিত করে জাত-পাতের ভিত্তিতে গভীর-বিভেদের সৃষ্টি করছে। সংরক্ষণের মাধ্যমে নিঃশুল্ক শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে সহজ লভ্য আসন, কর্মসংস্থানে সুবিধা এবং দ্রুত পদোন্নতি ইত্যাদির প্রলোভনে বিভিন্ন রাজ্যে অন্তত অনগ্রসর শ্রেণীর তক্‌মা লাভের আশায় আন্দোলন এবং সাম্প্রদায়িক সংঘাত নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। বহু অন্য বর্ণ, সম্প্রদায় এবং গোষ্ঠীর মানুষ যেনতেন প্রকারেণ তপশীলি জাতি, উপজাতি অথবা অথবা অনগ্রসর গোষ্ঠীর শংসাপত্রের জন্য লালায়িত, ভ্রষ্টাচারের সহায়তা গ্রহণেও প্রস্তুত। এই পরিপ্রেক্ষিতে কিছু গজিয়ে ওঠা রাজনৈতিক দলনেতা, নেত্রী রাজনৈতিক ফায়দা তুলে ক্ষমতা দখলের প্রয়াসেও লিপ্ত। কিস্‌সা একমাত্র কুর্সী কা। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মনে হয় নৈতিকতার অপমৃত্যু ঘটেছে। তার পরিবর্তে অর্থনৈতিক মাপকাঠির ভিত্তিতে সংরক্ষণ এবং অন্যান্য সুবিধা দিলে সর্বশ্রেণীর মানুষ সমান সুযোগ পেতেন এবং জাতপাতের অথবা ধর্মের ভিত্তিতে সমাজ বিভাজিত হোত না। ২২ জুলাই সংসদে আস্থা ভোটের আলোচনায় এ তথ্য যেভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, স্বাধীনতার ৬০-৬২ বছর পর বার বার মনে হয়েছে রাজনৈতিক দেউলিয়াপনার এমন দৃষ্টান্ত কখনও দেখতে হবে ধারণা করা যায়নি। বাইরের চাকচিক্যের আড়ালে উঁইপোকা যেন নিঃশব্দে ভারতীয় গণতন্ত্রের অন্তঃসার কুরে কুরে শেষ করে দিয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত ভারতের 'আম আদমি'। কোথায় কখন, কোনপথে সন্ত্রাসবাদীর ছোবল আসবে সেই শঙ্কায় সে শঙ্কিত। বহিঃশত্রুর আক্রমণ এবং সন্ত্রাসবাদীদের অনুপ্রবেশ রোধে সামরিক বাহিনী সদাই প্রস্তুত। বারংবার সে শত্রু পক্ষের প্রচেষ্টা জীবনের বিনিময়ে বানচাল করে দিয়েছে। কিন্তু যে গৃহশত্রু জেহাদী সন্ত্রাসবাদীদের অর্থ, আশ্রয়, সহযোগিতা, অস্ত্র ইত্যাদি দিয়ে সাহয্য করছে, এবং হাজার হাজার 'সুপ্ত সেল' (স্লিপার সেল) ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে আঘাতের জন্য পকিস্তানী আই এস আই-এর আদেশের প্রতীক্ষারত। তাদের বিরুদ্ধে জাতীয় ও রাজ্যের গোয়েন্দা বাহিনী ফলপ্রসূ ব্যবস্থা গ্রহণে অপারগ রয়েছেন। কথায় বলে কিছু জায়গা সব সময়ের জন্য এবং সব জায়গায় কিছু সময়ের জন্য কঠোরভাবে পাহারা দেওয়া যায়, কিন্তু সব জায়গা সব সময়ের জন্য পাহারা দেওয়া সম্ভব নয়'। শুধুমাত্র গোয়েন্দা বাহিনীকেই ঢেলে সাজালে সমস্যার সুরাহা হবে না। প্রতিটি ভারতবাসীকে এই কদর্য জেহাদী সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সামিল হতে হবে।

একটি জাতির জীবনে ৬০-৬২ বছর একটি পল মাত্র। কিন্তু এই একটি পলেও যদি ভারতবাসীর জীবন-ধর্ম-সম্পত্তির

> **১৯৪৭-এর সেই খন্ডিত স্বাধীনতায় কি সুফল লাভ হল? ভারতবাসী আশা করেছিল, প্রতিদিনের সেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার হাত থেকে অন্তত ভারতবাসী নিস্কৃতি পাবে। আলাদা ভূখন্ড নিয়ে তারা সুখে থাক, প্রগতি করুক। উন্নতি করুক, অন্তত একটি সু-প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে উঠুক। ৬২ বছর পর মনে হচ্ছে সবই যেন**

নিরাপত্তা নিশ্চি ত করা সম্ভব না যায়, তাহলে স্বাধীনতা, উন্নতি, প্রগতি সব কিছুই অর্থহীন হয়ে পড়ে। রীতিঅনুযায়ী ভারতের মাননীয়

(এরপর ১০ পাতায়)

নেত্রদান মহাদান

EYE BANK

23218327, 23592931, 22413853
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

চিঠিপত্র

মাদারল্যাণ্ড

স্বস্তিকায় ২৯ আষাঢ় ১৪১৫ (১৪.৭.০৮) সংখ্যার ২৫ পৃষ্ঠায় শ্রী অজিত বিশ্বাস লিখিত প্রবন্ধ "বরুণ সেনগুপ্ত ও গৌরকিশোর ঘোষ" সম্বন্ধে এই পত্র।

উনি লিখেছেন : "...দিল্লীতে সব কয়টি কাগজের অফিসে ২৬ জুন বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হল। ফলে পরদিন দিল্লীর কোনও সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়নি। কেবল Motherland পত্রিকার ১ পাতার কপি বেরিয়েছে। তার পরেই Motherland কাগজের অফিসে তালা লাগিয়ে দেওয়া হল"।

আমি সেই সময় Motherland পত্রিকার Chief of the Bureau ছিলাম। (এই পদ Special Correspondent-দের নেতাকে দেওয়া হয়)। তাই ২৫ জুন ১৯৭৫-এর রাত্রি থেকে ২৬ জুন রাত্রি পর্যন্ত যা হয়েছিল তা লিপিবদ্ধ করছি। এতদিন হয়ে যাওয়ায়, অনেকেই ঘটনাগুলো ভুলে গেছেন, যা স্বাভাবিক।

সকলেই জানেন যে ১২ জুন, ১৯৭৫-এ ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয় যে রায় দেন তারপর ওঁর আর প্রধানমন্ত্রী থাকা Politically and Morally উচিত ছিল না। শ্রী মালকানিজীর নেতৃত্বে আমরা এই বিষয়টাকেই তুলে ধরেছিলাম। আমরা ইন্দিরা গান্ধীকে ''Impostor'' (ছদ্মবেশী) Prime Minister বলে লিখতে আরম্ভ করেছিলাম। এমনিতেই ইন্দিরা গান্ধী আমাদের Motherland-কে মনে -প্রাণে ঘৃণা করতেন। কেননা আমরা ওঁকে ছেড়ে কথা বলতাম না।

২৫ জুন ১৯৭৫-এর রাত্রে ১১.৩০ -এ বাড়ি যাবার সময় আমি ও সহযোগী সোমেশ্বর রাও একসাথে Chief Sub-Editor শ্রীভান (Bhan)-কে বললাম যে "আমরা এখন বাড়ি যাচ্ছি। তবে রাত্রে কিছু হলে আমাদের জানাবেন, আমরা চলে আসব। ''Why do you think something will happen? উনি জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বলেছিলাম : ''She is desperate and can do anything''।

বাড়ি পৌঁছে রাত ১২.৩০ নাগাদ শুতে গেলাম। কিন্তু ১.৩০ নাগাদ অফিস থেকে ফোন এল, ''Dr Ghosh, please come, Mr. Malkami has been arrested, We are Sending the car for you''. গরমকাল, তৈরি হতে দেরী হল না। গাড়ি আসার আগে আমি জনসঙ্ঘের নেতাদের বাড়িতে ফোন করে খবর জানাবার চেষ্টা করলাম। কেউই টেলিফোন তুললেন না। বুঝলাম ওঁরা আগেই সব জেনে গা ঢাকা দিয়েছেন। অফিস পৌঁছে প্রথমেই মালকানিজীর বাড়িতে ফোন করে সব জেনে নিলাম। (K.R.Malkaniji -এর ''The Midnight Knock'' বইয়ে বিস্তারিত ঘটনার বিবরণ আছে)। পরে PTI অফিসে ফোন করে জানালাম।

তখন রাত্রি দুটো। আমি ও শ্রীভান মিলে ঠিক করলাম খবরটা প্রথম পাতায় 1st lead হবে। অন্য অনেক খবরও আসতে লাগল, বিশেষ করে UNI এর Teleprinter-এ জয়প্রকাশ নারায়ণের ও চন্দ্রশেখরের গ্রেপ্তার, জে পি-র সেই বিখ্যাত উক্তি "বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি" ইত্যাদি সব কিছুই এসে গেল। আমরা তিনটে বাজার আগে প্রথম পাতাটা Compose করিয়ে flonging (এই technology-তেই তখন খবরের কাগজ ছাপা হত)-এর জন্য তৈরি হলাম। ঠিক তখনই। রাত্রি তিনটের সময়, অফিস অন্ধকার হয়ে গেল। মানে বিদ্যুৎ সরবরাই বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু আমাদের Printing Press-এর কর্মচারীরা (শ্রী মালিক ওঁদের নেতা ছিলেন) হাল না ছেড়ে চেষ্টা করলেন জানতে ফলটা কোথায়। শেষে তাঁরা পৌঁছালেন সেই Electric Pole-এ যেখান থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হতো। গিয়ে দেখলেন যে চার পাঁচজন পুলিশের লোক সেখানে উপস্থিত। আমাদের কর্মীরা যখন বললেন যে তাঁরা কাগজের বিদ্যুৎ সরবরাহ চেক্ করতে এসেছেন, পুলিশের লোকেরা বলল, "আখবার সে আয়ে হো? বিজলী নহীঁ মিলেগী"।

বোঝা গেল যে ইন্দিরা গান্ধী এবার পুলিশ দিয়ে সত্যের টুঁটি চেপে দিতে চান।

রাত্রি ৩.৪৫ -এ "We will meet again after dictatorship ends and democracy is restored'' — এই কথা বলে শ্রী ভান এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি ফেরত গেলাম।

পরের দিন সকালে All India Radio-র সকাল আটটার হিন্দী বুলেটিনে ঘোষক-ঘোষিকার বদলে স্বয়ং ইন্দিরা গান্ধী ঘোষণা করলেন যে "রাষ্ট্রপ্রতিজী নে Emergency লাগু কী হ্যায়। লেকিন উস্‌সে ডরনে কি জরুরত নহীঁ হ্যায়।'

আবার একটু ঘুমোবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ১০.৩০ নাগাদ ফোন এল "ঘোষজী জলদি চল আইয়ে, বিজলী আ গয়ী হ্যায়" (সেদিন সকালে hawker একটাও কাগজ দেয়নি)। তাড়াতাড়ি অফিস পৌঁছে দেখলাম শ্রীমালকানী ছাড়া আর সকলেই উপস্থিত। আমি ও News Editor C.S. Jayaram ও অন্যান্যরা ঠিক করলাম যে আমরা একপাতার একটা Supplement ছাপব গত রাত্রের সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিয়ে। সকলকে বললাম তাড়াতাড়ি করতে। আরও বললাম হয়ত এটাই The Motherland এর শেষ ইস্যু হবে। কেবল প্রথম পাতাটার কাজ বাকী ছিল। পেছনের পাতাটা গত রাত্রিতে তৈরিই ছিল। কেবল একটা Lead story, একটা Local Story (কে কে arrest হয়েছিলেন ইত্যাদি) লেখার দরকার ছিল।

টাইপ রাইটারে বসেছি কী আমাদের এক কর্মচারী শ্রীপান্ডে আমাকে UNI এর teleprinter থেকে একটা খবরের tear sheet দিল। তাতে খবর ছিল সরকার Censorship লাগু করেছেন। সব খবর Press Information Bureau (PIB) থেকে ক্লিয়ার করাতে হবে।

খবরটা দেখেই আমার মাথায় পারা চড়ে গেল। দাঁড়িয়ে উঠে সেই কাগজটাকে টুকরো টুকরো করে জুতোর তলায় পিষে সকলকে বললাম ''No Censorship for the Motherland''. সকলেই সম্মতি দিলেন। ইতিমধ্যে আমাদের পুরোনো সাথী বীরেন্দ্র কাপুর এসে গেল। তখন বীরেন্দ্র Indian Express-এ চলে গেছে কিন্তু পুরানো Loyalty না ভুলে আমাকে বলল যে ''local story-টা আমিই লিখব। আমাদের কোনও আপত্তি ছিল না।

বেলা একটা নাগাদ Supplement-টা ছাপা হলে বাড়ি গেলাম। বিকেলে ফেরত এসে জানলাম যে Supplement-টা হাজার হাজার সংখ্যায় বিক্রী হয়েছে। হবে নাই বা কেন? একমাত্র এই একটা কাগজই Censorship-এর তোয়াক্কা না করে সত্যি ঘটনা প্রকাশ করে দিয়ে ইন্দিরা গান্ধীর চেষ্টাটা (যে দেশের বা বিদেশের কেউই না জানুক ২৫-২৬ জুনের রাত্রে কী হয়েছিল) আমরা নাকচ করে দিয়েছিলাম।

Motherland-এর সাংবাদিক আর কর্মীদের এই বিরাট অবদান কিন্তু পরে বিশেষ কেউ উল্লেখ করেননি। এই সেদিনই মধ্যপ্রদেশ সরকার Emergency Victims -দের সম্মান করলেন। কিন্তু Motherland এর লোকেদের কথা কেউ মনে রাখেননি। ফলে অনেক লেখকই অসম্পূর্ণ সংবাদ লেখেন।

যাক্। আমরা সেদিন সন্ধ্যায় ডাক -Edition ছেপেছিলাম আর তা সাধারণত পাঞ্জাব চন্ডীগড় ইত্যাদি স্থানে ট্যাক্সি করে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। (যাঁরা পেয়েছিলেন, পুলিশ তাঁদের অনেককে গ্রেপ্তার করেছিল)।

আমরা ২৭ জুনের edition-এর জন্য তৈরি হচ্ছিলাম। বলেছিলাম যে আমরা রাত্রি ১১ টা নাগাদ flonging করব, তিনটের সময় নয়। ছাপাখানার কর্মীরাও রাজী ছিলেন। হঠাৎ সেই সময় স্থানীয় Paharganj Police Station থেকে কিছু Constable আর একজন Sub-Inspector (মনে হয়) এসে আমাদের সকলকেই অফিস থেকে বের করে Motherland অফিসে তালা লাগিয়ে দিল।

সেইদিনই মালকানীজীর নেতৃত্বে চলা এই সাহসী সংবাদপত্রের মৃত্যু হয়। আমদের যারা Motherland এ কাজ করেছেন — একমাত্র দুঃখ যে এই মৃত্যুর জন্য ১৯৭৭-এ বা তার পরেও আত্মীয় স্বজনরা বিশেষ কেউ অশ্রুপাত করেননি।

অরবিন্দ ঘোষ, দিল্লী

বামপন্থী মিথ্যাচার

অবশেষে যেটা প্রত্যাশিত ছিল সেটাই বাস্তবে পরিণত হল। দিল্লীতে পরমাণু ইস্যু নামক এক খুড়োর কল দেখিয়ে সি পি এম, কংগ্রেস-এর দোস্তির জমানা শেষ হল। ভাবতে অবাক লাগে ইউ পি এ জমানায় বাজারে আগুন লেগেছে। জিনিসপত্রের দাম আকাশ ছুঁয়েছে। আমজনতার জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। এসব নিয়ে মেকি বামপন্থীরা কোনও আন্দোলন করেনি, সমর্থন প্রত্যাহারের হুমকি দেননি, এই চার বছরে। অথচ তাদের এমন রণং দেহি মূর্তি যে একটা নাটক তা আজ দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার। তাদের সামনে এছাড়া আর কোনও পথ খোলা ছিল না।

সকলেই আজ বুঝতে পারছে, দিল্লী সরকারের কাছে আরও বেশি দাবি এবং দর কষাকষি করতে গিয়েই নিজেদের বিপদ ডেকে এনেছে সি পি এম। মূল্য বৃদ্ধি র মতো একটা জবরদস্ত ইস্যু হলেও বোধহয় খানিকটা মুখ রক্ষা হত! কিন্তু "পরমাণু চুক্তি করা চলবে না" এটা আসলে ফাঁকা আওয়াজ। তাদের গুরু চীন সরকার যখন পরমাণু চুক্তি করে তখন তারা নীরব থাকে আর ভারতের ক্ষেত্রে সেই একই চুক্তি সম্পাদন করলে তারা প্রবলভাবে বাধা দেয়। এই দ্বিচারিতা সি পি এমের চিরকালীন অভ্যাস। আসলে চীনকে মদত দিয়ে ভারতীয় অর্থনীতিকে দুর্বল করার জন্য সি পি এমের এই কৌশল।

ইউ পি এ সরকারের উপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে এখন তারা উভয় সঙ্কটে পড়েছে। সি পি এমের পুরনো মিত্র সমাজবাদী পার্টির প্রধান মুলায়ম সিং যাদব ইউ পি এ সরকারকে সমর্থন করায় সরকার পড়েনি। এটা সি পি এমের কাছে গাত্রদাহের কারণ। অদৃষ্টের কী নিদারুণ পরিহাস। ইউ পি এ চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধীর মোক্ষম চালে তারা পুরোপুরি বোকা বনে গিয়েছে। পরমাণু চুক্তি নিয়ে পার্টির কেন্দ্রীয় নেতারা লম্বা-চওড়া ভাষণ দিয়ে এসেছেন। এখন তাদের পক্ষে পিছু হটা মুশকিল হয়ে পড়েছিল।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, বিশ্বাসঘাতকতার এই পরম্পরা সি পি এমের কাছে নতুন কিছু নয়। ১৯৭৭ সাল থেকে বছর দুই কেন্দ্রে মোররজি দেশাই সরকারের সঙ্গে থেকে আজকের মতই ঠুনকো যুক্তি খাড়া করে তারা সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। সেবার সাম্প্রদায়িকতার আওয়াজ তুলেছিল তারা। অথচ মজার কথা ১০ বছর পর তাদের সাজানো সাম্প্রদায়িক শক্তি বি জে পি-র সঙ্গেই হাত মিলিয়েছিল সি পি এম রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসকে রুখতে। ১৯৮৮ সালে ৩ জুলাই কলকাতার শহীদ মিনারে অটলবিহারী বাজপেয়ির সঙ্গে একমঞ্চে সভা করেছিলেন জ্যোতি বসুরা।

ভারতীয় রাজনীতিতে কমিউনিস্টদের মতো মুখোশধারী সুবিধাবাদী রাজনীতি করার ট্র্যাডিশন আর কোনও দলের নেই। বর্তমান পরিস্থিতিতেও তারা কোনও রাজনৈতিক আদর্শ অনুসরণ করে সরকারের পতন চায়নি। তারা মনে করছে, তাদের কৃতকর্মের ফলে তাদের সমর্থিত ইউ পি এ সরকারের বিরুদ্ধে জনরোষ জাগ্রত হচ্ছে। তাই সি পি এম একটা উগ্র ভাবমূর্তি ধরার চেষ্টা করছে, নিজেদের বাঁচার জন্য। যাতে করে আগামী লোকসভা বৈতরণী পার হওয়া যায়। তা যে হয় সেই সত্য তাদের থেকে বেশি ভালো আর কেউ জানে না। হায় ভন্ডামির কি বিচিত্র নমুনা!

সুশান্ত কুমার দে, কলকাতা - ১৪

২০০৮-এর স্বাধীনতা দিবস

(৯ পাতার পর)

প্রধানমন্ত্রী লালকেল্লা থেকে তোপধ্বনি সহ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন। জাতির প্রতি ভাষণ দেবেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবেন। কিন্তু তিনি কি দায়িত্ব নিয়ে ঘোষণা করতে পারবেন, রাষ্ট্রের সমস্ত স্তর থেকে ভ্রষ্টাচার নির্মূল করে দেবেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের শহীদদের সঙ্গে নেতাজী সুভাষ যে রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখতে দেখতে তাঁর সমস্ত জীবন সমর্পণ করে হারিয়ে গেলেন, সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত করবেন? ভোট -ব্যাঙ্কের রাজনীতি নির্মূল করার প্রয়াস করবেন এবং প্রতিটি ভারতবাসীর অমূল্য প্রাণ যাতে জেহাদী আততায়ীর বোমার আঘাতে অকালে ঝরে না যায় সে ব্যবস্থা করবেন? ভারতের বর্তমান নৈতিকতাহীন রাজনৈতিক পরিবেশে কোনও প্রধানমন্ত্রীই এমন ঘোষণা করতে সক্ষম হবেন না। শত প্ররোচনার যুগেও ভারতবাসীকে শান্ত থাকতে, সাম্প্রদায়িক শান্তি বহাল রাখার আবেদনই করবেন। তার বেশী কিছু নয়। আশা করবো অন্তত লালকেল্লার ওই সভায় সন্ত্রাসবাদীরা যেন কখনও সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটাতে সক্ষম না হয়। আমরা সাধারণ ভারতবাসীরা আসুন নিজ নিজ এলাকায় নিজেদের সুরক্ষার জন্য নিজেরাই কঠোর নজরদারির ব্যবস্থা করি। এটাই এ বছরের স্বাধীনতা দিবসের সঙ্কল্প।

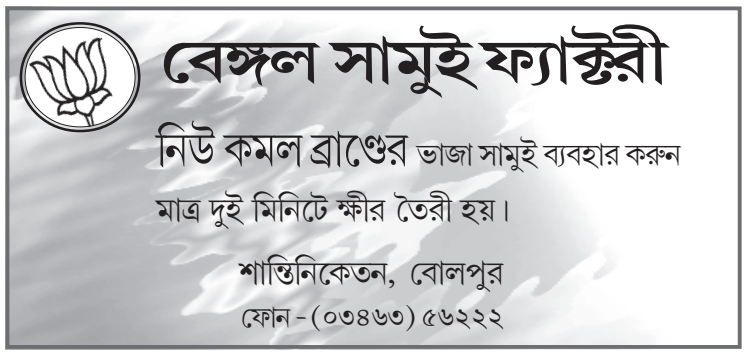

স্বদেশ আত্মার বাণীমূর্তি শ্রীঅরবিন্দ

হরিশ্চন্দ্র রায়

ভারতের আধ্যাত্মিক মনীষার চেতনসত্তায় প্রাণবন্ত হয়ে আছে বিশ্ববোধ, শাশ্বত হয়ে রয়েছে মানবিকতা, সীমার মাঝে অসীমের সন্ধানের অনিঃশেষ আকাঙ্ক্ষা, আছে জীবনসত্তার সেই অমৃত সত্তার মধ্যে বিলীন হয়ে মুক্তির অমৃতস্বাদ লাভের বিস্ময়কর মন্ত্রণা। তাঁদের অন্তরসত্তা সমাধিস্থ ভারতের ঐতিহ্যে। তাই মুক্তির পরম মন্ত্র স্মরণাতীতকাল থেকে উদ্‌গীত হয়ে আসছে ভারতের মহাপুরুষদের, মুনিঋষিদের কণ্ঠে। সকল যুগের মানুষের জন্য রেখে গেছেন তাঁরা অমৃতের সঞ্চয়। সেই সব সর্বত্যাগী মহাত্মাদের উত্তরসূরীদের অন্যতম শ্রীঅরবিন্দ। বিধাতার অলৌকিক আত্মপ্রকাশ হয়েছে শ্রী অরবিন্দের মধ্যে।

আই. সি. এস. পরীক্ষার শেষ অশ্বারোহন পরীক্ষায় অরবিন্দের অনুপস্থিতি তাঁর মহাজীবনে উত্তরণ, ভবিষ্যতের মহামানব ও লোকগুরুর এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীর পুণ্য আবির্ভাব, স্বাধীন ভারতের আগমন লগ্নের ইঙ্গিতবাহী। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ভারতের মুক্তি সংগ্রামের নতুন অধ্যায়। জাতীয় জীবনের এ মাহেন্দ্রক্ষণের প্রতীক্ষায় ছিলেন অরবিন্দ। বরোদার রাজকাজ ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন বাংলার কর্মক্ষেত্রে। শুরু হলো তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুভ উদ্‌বোধন। শিক্ষাব্রতী অরবিন্দ হলেন ভারতের মুক্তিসংগ্রামের এক নেতা ও রাজনৈতিক চিন্তানায়ক অরবিন্দ।

রাজা রামমোহন থেকে আরম্ভ করে ভারতের আধ্যাত্মিক রাজনৈতিক মহাকাশে যে সব সমাজ সংস্কারক, রাষ্ট্রনেতা, অধ্যাত্ম মহামানবের আবির্ভাব হয়েছে ভারতের মুক্তিসংগ্রামে ভারতের আত্মিক জাগরণের ওপর তাঁদের সকলেই প্রায় সমান গুরুত্ব আরোপ করেছেন। (ইতালীর জাতীয় ঐক্যে ও জাগরণে ম্যাৎসিনির অবদান স্মরণীয়)। তাই রামমোহন বিদ্যাসাগর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-র সমাজচিন্তা ও ভারতের মুক্তিচিন্তার মন্দাকিনীধারায় অবগাহন করেছে শ্রীঅরবিন্দের স্বদেশপ্রেম। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। বঙ্কিম-বিবেকানন্দের সামনে দেশমাতা দেবীরূপে আবির্ভূতা এবং বন্দিতা। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের ধ্যানকল্পনায়, তাঁর সাধনায় জগন্মাতা ও দেশমাতা অভেদাত্মার জ্বলন্ত প্রতিমা। তিনি স্বদেশবাসীর কাছে জানালেন এই মাতৃপূজায় তাঁদের চরম ত্যাগ ও আত্মদানের আহ্বান। রাজনীতির ধুলিধূসর ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক শক্তি, আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রয়োগের দিক্ দিয়ে শ্রীঅরবিন্দ অবতীর্ণ হলেন এক পথিকৃৎরূপে।

শ্রীঅরবিন্দের দৃঢ় বিশ্বাস, অধ্যাত্ম ভারতের জাগরণ অদূর ভবিষ্যতে আসবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ ভারতবর্ষে তথা সারা বিশ্বে নবজাগরণের মধ্যদিন। শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও বিবেকানন্দের আবির্ভাব অধ্যাত্ম ভারতের জাগরণের পথ প্রশস্ত করেছে। দক্ষিণেশ্বরের ঐ পাগল ঠাকুরের পদপ্রান্তে সারা বিশ্বের লোক এসে জড়ো হচ্ছে। তাঁর মতে, "বিগত পাঁচ শত বছরের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতো দ্বিতীয় একটি পুরুষ পৃথিবীতে আবির্ভূত হন নাই।" অতএব ভারতের আত্মিক ও আধ্যাত্মিক জাগৃতি অচিরে আসবে। বন্দেমাতরম্ পত্রিকার সম্পাদকরূপে দেশনায়ক শ্রীঅরবিন্দ জাগিয়ে তোলেন স্বদেশের আধ্যাত্মিক চেতনা। তাঁর বক্তব্য, ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা একান্ত প্রয়োজন। কারণ, এর মধ্যে আছে ভারতের আধ্যাত্মিক জাগরণ, আর এই আধ্যাত্মিক জাগরণের মধ্যে আছে জগতের কল্যাণ, ভারতের কল্যাণ। তাই শিক্ষাব্রত ত্যাগ করে শিক্ষাব্রতী শ্রীঅরবিন্দ দাঁড়ালেন রাজনীতির পুরোভাগে।

।। ১৫ আগষ্ট জন্মদিবস উপলক্ষে প্রকাশিত।।

শ্রীঅরবিন্দের জাতীয়তাবাদ ধর্মনিষ্ঠ— ভাগবতাশ্রিত। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, "এ (জাতীয়তাবাদ) হচ্ছে একটি ধর্ম, যাকে আশ্রয় করে আমরা বাঁচতে চেষ্টা করব। এ একটা ধৃতি যার সাহায্যে আমরা জাতির মধ্যে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করতে চাই। ভারতের এই ত্রিশ কোটি জনগণের মধ্যেই আমরা তাঁকে পাবার চেষ্টা করছি।" তাঁর বক্তব্য—'সনাতন ধর্ম — এইটিই হচ্ছে জাতীয়তা।" কী সার্বজনীন দেশাত্মবোধ! "জাতীয়তাবাদের এক অদ্ভুত ব্যাখ্যা! এক নূতন মন্ত্র, আর নূতন মন্ত্রচৈতন্য!" এমন জাতীয়তাবাদ পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

যাঁর হৃদয়রাজ্য বিরাট পুরুষের বিরাটত্বে বিলীন, চেতনসত্তায় যাঁর অতিন্দ্রিয় অনুভূতির ব্যাকুলতা, পৃথিবীর অণু-পরমাণুতে যাঁর বাসুদেব চৈতন্যময় সত্তায় বিরাজমান। যাঁকে উত্তীর্ণ হতে হবে মুক্ত মহাসাধকের মহাজীবন সমুদ্রে এবং সেক্ষেত্রেও প্রস্তুত যখন, তখন আলিপুরের কারাগারের রক্ষীর অথবা বৃটিশ শক্তির অথবা বিশ্বের কোন শক্তির ক্ষমতা আছে এমন প্রমুক্ত পুরুষকে ক্ষুদ্র গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখে? কারাগারের সব কিছুই তাঁর কাছে হয়ে উঠলো জীবন্ত ও চৈতন্যময়। কারাগারের সেই অতীন্দ্রিয় অনুভূতির বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন — "তারপর তিনি আমার হাতে গীতা দিলেন। তাঁর শক্তি আমার মধ্যে প্রবেশ করলো এবং আমি গীতার সাধনা অনুসরণ করতে সক্ষম হলাম।...দেখলাম, আমি আর জেলের উচ্চ দেওয়ালের মধ্যে বন্দী নেই। আমাকে ঘিরে রয়েছেন বাসুদেব!" অন্তর্দর্শী কৌঁসুলী চিত্তরঞ্জন দাশ বিচারক মিঃ ব্রীচক্রফ্‌টের সামনে দাঁড়িয়ে অরবিন্দ সম্বন্ধে বলে উঠলেন — "এই বিতন্ডা, কোলাহল, আন্দোলন স্তব্ধ হবার বহুকাল পরে, এঁর অন্তর্ধানের দীর্ঘকাল পরে মানবসমাজ এঁকে স্বদেশপ্রেমের মহাকবি, জাতীয়তার প্রবর্তক, মানবপ্রেমিক বলে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবে। এঁর তিরোধানের দীর্ঘকাল পরে এঁর বাণী শুধু ভারতবর্ষে নয় সাগরপারের দূরদূরান্তে ধ্বনিত হতে থাকবে।" এমন ভবিষ্যদ্বাণীর কাজ অনেক দিন থেকে শুরু।

কারাজীবন থেকে মুক্তির পর চন্দননগরে অরবিন্দের আত্মগোপন। তারপর পন্ডিচেরী গমন। তারিখ ১৯১০ সালের ৪ এপ্রিল। রাজনৈতিক উত্তেজনা, সংসারের বন্ধন, আত্মীয়স্বজনের আকর্ষণ সব কিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে অলৌকিক জগৎ, আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশের সাধনায় হলেন নিমগ্ন। শুরু হলো সাধনা। মহাজ্যোতিষ্কদের পুণ্যজ্যোতির স্পর্শে আর এক মহাজ্যোতিষ্কের আবির্ভাব। শ্রীরামকৃষ্ণদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা, যোগী বিষ্ণুভাস্কর, স্বামী ব্রহ্মানন্দজী — এঁদের ঐশী শক্তির প্রভাব সঞ্চারিত শ্রীঅরবিন্দে। বাসুদেবময় তাঁর অন্তরলোক।

পৃথিবীর অগণিত পুণ্যাত্মার অন্তরাত্মা নিবেদিত মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দর পাদবেদীমূলে। পন্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দর বিশ্বমানবে উত্তরণ। তাঁর স্পষ্ট আশ্বাস ও দৃঢ় বিশ্বাস, "মানুষের চেষ্টায় ও সাধনায় অতিমানবের অবতরণ অথবা শ্রেষ্ঠতর ও মহত্তর বিবর্তনকে ত্বরান্বিত করা যায়।" পন্ডিচেরী আশ্রম আজ মহামিলনের পুণ্যতীর্থ। মহামানব শ্রীঅরবিন্দ আজ বিশ্ববন্দিত। শ্রীমা (প্রয়াত) আজ জগতনন্দিতা। ১৯৫০ সালের ৫ ডিসেম্বর মহাপুরষের হলো মহাপ্রস্থান।

সারা বিশ্বে ভগবৎ সত্তার মহত্তম শক্তির পূর্ণবিকাশ সম্ভাবনায় যিনি বিশ্বাসী, যিনি শ্রীকৃষ্ণের আলৌকিক শক্তির প্রত্যক্ষদর্শী, যাঁর ঐশী শক্তির পুণ্য স্পর্শ সাগর-সমুদ্র-নীলাকাশ ও ধরণীর প্রতিটি অঙ্গে সঞ্চারিত, যিনি এক অখন্ড World State-এর কল্পনা করেছেন সেই মহামানব শ্রীঅরবিন্দকে সহস্র প্রণাম জানাই, হে-স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্ত্তি —

".....আছ জাগি
পরিপূর্ণতার তরে সর্ববাধাহীন—
যার লাগি নরদেব চিররাত্রিদিন
তপোমগ্ন, যার লাগি কবি বজ্ররবে
গেয়েছেন মহাগীত, মহাবীর সবে
গিয়েছেন সংকটযাত্রায়, যার কাছে
আরাম লজ্জিত শির নত করিয়াছে,
মৃত্যু ভুলিয়াছে ভয় — সেই বিধাতার
শ্রেষ্ঠ দান আপনার পূর্ণ অধিকার
....."

(নমস্কার - রবীন্দ্রনাথ)

ভারত ভাগের দায়

(৮ পাতার পর)

ওয়াকিবহাল ছিল। যেসব নিয়ম রীতি আচরণের উপর হিন্দুদের আজন্ম নিষ্ঠা ও দুর্বলতা ছিল, নতুন ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত ইরাকী-ইরানী-আফগানীরা আক্রমণকারী হিসেবে ভারতে প্রবেশ করে হিন্দুদের সেসব দুর্বল স্থানে আঘাত হানল। নরহত্যায় এদের কুণ্ঠা নেই, পরধন লুণ্ঠনে এদের দ্বিধা নেই, পরনারী হরণ ও ধর্ষণ এদের বিবেকে বাধে না, পরের ঘরবাড়ি পোড়াতে এদের চরম উল্লাস, যে গরুকে হিন্দুরা মাতৃস্বরূপা মনে করে দেবতা জ্ঞানে পূজা করে, সেই গরুকে অনায়াসে হত্যা করে এরা তার মাংস ভক্ষণ করে।

আর সে হত্যা পদ্ধতিও কি নৃশংস! ঐ শান্ত অবলা অবোধ প্রাণীকে গলায় আড়াই পোঁচ মেরে তার ছটফট মৃত্যু যন্ত্রণায় পৈশাচিক উল্লাসে নাচে। আর এসব নিষ্ঠুরতা, বর্বরতা ও পৈশাচিকতার সমর্থন কেতাবে আছে বলে খোদার মহিমা কীর্তন করে। হিন্দুদের মুখে জোর করে সেই গো-মাংস পুরে দিয়ে তাদের ধর্ম নষ্ট করে।

সুতরাং যে হিন্দুদের ঘরের মেয়েটিকে কেড়ে নিয়েছে, গৃহপালিত গরুটিকে হত্যা করে গোস্ত খাইয়ে জাতি ধর্ম নষ্ট করেছে, ঠাকুর মন্দিরটি ভেঙ্গেছে, দেবতার-মূর্তিগুলি চুরমার করেছে, বিষয় সম্পত্তি লুঠপাট করেছে, প্রিয়জনদের নির্বিচারে হত্যা করেছে, ঘরবাড়ি পুড়িয়ে নিরাশ্রয় করেছে, প্রাণের ভয় দেখিয়ে মুসলমান করেছে এবং বর্তমান যুগেও যারা সেসব অমানুষিক অমানবিক আচরণের জয়গান করছে, অনুষ্ঠান পালন করছে সেসব "মুসলমান সম্পর্কে বিদ্বেষের বিষ হিন্দুদের মন থেকে সম্পূর্ণ ভাবে নির্বাশিত করার পথ কি মুসলমানরা খোলা রেখেছে?

রবীন্দ্রনাথ, সুদূর অতীতের কথা বাদ থাক, তাঁর জীবদ্দশাতেই সারা ভারতের কথা দূরে থাক, সোনার বাংলার বুকেই ইসলাম ধর্ম ও তার অনুসারীদের এই বীভৎস রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন বলেই স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, শত শত বৎসর ধরে নির্মম অত্যাচারের শিকার হিন্দুদের মনে মুসলমান সম্পর্কে যে বিদ্বেষের বিষ সঞ্চিত হয়েছে তা নির্বাসিত করার ক্ষমতা গাঁধীজির নেই। অবশ্য কবির নিজেরও নেই। যাদের আছে, তারা দু'শ বছরের ব্রিটিশ শাসনে একটু স্তিমিত নিস্তেজ থাকলেও ব্রিটিশ শাসন শিথিল হতেই দু'বছরেই দু'শ বছরের বকেয়া চক্রবৃদ্ধি সুদ সহ উশুল করে নিয়েছে।

সুতরাং এসব বিষয়ে কলম ধরার আগে আমিনুল ইসলামের মতো লেখকগণ তাদের পূর্ব পুরুষদের কুকর্ম-দুষ্কর্ম সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিবহাল হয়ে কলম ধরলে নেকা সাজতে হবে না। ধরা পড়ে যাবেন।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ **যৌগিক নার্সিংহোম** (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

সবারে করি আহ্বান

ভগবান শ্রী শ্রীকৃষ্ণের

আনুমানিক ৫২৩৬তম

জন্ম জয়ন্তী উৎসব

পালিত হবে আগামী

৭ই ভাদ্র, ১৪১৫

(২৪শে আগষ্ট, ২০০৮)

রবিবার,

স্থান ঃ রাধাগোবিন্দ ভবন

১৯১, রাজারহাট রোড, তেঘরিয়া

কলকাতা - ৭০০ ০৫৯

ফোন ঃ ২৫৭০ ১৭৯০

নম্রতার গুণ

রুদ্র রায়

একবার জঙ্গলে সমস্ত গাছের মধ্যে কে বেশি শক্তিশালী এই নিয়ে প্রচণ্ড তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়। প্রকাণ্ড বট বৃক্ষ অন্যদের মত প্রকাশের আগেই বলল, তোমরা বৃথা তর্কে যাচ্ছ। যেখানে আমি বর্তমান, সেখানে কে বেশি শক্তিশালী তা নিয়ে বিচারের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। বটের কথা শুনে অন্যদের ভীষণ রাগ হল। তারাই বা কম কিসের। বটের শক্তিকে তারা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না। অশ্বত্থ গাছও নিজের শক্তিতে কম গর্বিত নয়। বটবৃক্ষ ও বাকীদের উদ্দেশ্যে সেও দু-একটা কথা শুনিয়ে দিল — আমার বয়স তোমাদের থেকে অনেকগুণ বেশি। লোকে আমাকে ফুল- বেলপাতা দিয়ে পুজো করে। আপন মনোবাঞ্ছা পূরণ করতে মানত করে। এটা কী কম ব্যাপার! আমি কী কম শক্তিশালী? সকলের প্রণম্যও আমি। বটের কথাগুলো শুনে সেগুন মনে মনে প্রচণ্ড গুমরাচ্ছিল। কিছুতেই আর সহ্য করতে না পেরে বলল, তোমরা জানো, আমার শক্তি না পেলে কোনও আসবাব তৈরি করা যায় না। শত শত মানুষের বোঝা বইবার শক্তি আমার মধ্যে আছে। আমার ডাল-পালাকে কাজে লাগিয়ে মানুষ নানান সৌখিন জিনিসপত্র তৈরি করে। রুটি রুজির ব্যবস্থা করে। আর তোমরা কিনা মিথ্যা শক্তির অহংকারে মত্ত? পর্বতের ওপর থেকে দেবদারু সব শুনছিল। আর মনে মনে হাসছিল। একটু পরে সেও তার শক্তি সম্পর্কে বলতে শুরু করল — তোমাদের কথা শুনে আমার ভীষণ হাঁসি পাচ্ছে। তোমরা কখনও ভেবেছ যে আমি কোথায় থাকি আর তোমরা কোথায়! পর্বতে হে পবর্তে; এখানে তোমরা কখনই থাকতে পারবে না। আমার স্থান তোমাদের সবার

বোধকথা

থেকে ওপরে। এরপরেও কী আর এই লড়াইয়ের দরকার আছে।

শক্তিশালী প্রমাণের এই উষ্ণ লড়াই শুধুমাত্র এখানেই সীমাবদ্ধ থাকল না। জঙ্গলের আম, জাম, কাঁঠাল, নিম, মহুয়া এরাও একে অপরকে ছাড়িয়ে নিজেদের গুণ বর্ণনা করতে লাগল। এ বলে আমাকে দেখ তো ও বলে আমাকে দেখ। এদের মধ্যে বাঁশের অহংকার সবাইকে ছাপিয়ে গেল। নিজের শক্তিতে গদ গদ বাঁশ বলল, তোমরা কি জানো না, জগতের সমস্ত মানুষ আমার সাহায্যে বিচার করে। আমি যদি একটা ঝাপটা দিই তখন তোমরা কে কোথায় পড়বে তার কোনও ঠিকানা থাকবে না। গলার স্বরকে আরও বাড়িয়ে বাঁশ বলল, শুনে রাখ, কথায় বলে — যার লাঠি তার মোষ। বাঁশের কথা সকলে মেনে নিতে না পারলেও কেও আর কোনও উত্তর দেওয়ার সাহস দেখাল না। বাবুল গাছ শুধু তার বুড়ো আঙুলের দিকে তাকিয়ে একটা হাসি হাসলো। গাছেদের বাক-বিতন্ডায় জঙ্গলের পরিবেশ ক্রমশ উত্তপ্ত হতে লাগল। সেই সময় মাটির তলা থেকে দুর্বাঘাস তার ছোটো মাথাটা তুলে বড়দের উদ্দেশ্যে বলল, তোমরা মিথ্যা কেন লড়াই করছ? কে বেশি শক্তিশালী এই নিয়ে অহংকার করে কী লাভ? দুর্বা ঘাসের কথা শেষ হবার আগেই সকলে অট্টহাস্য করে উঠল। তাকে ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দিল। শক্তিহীন দুর্বা চুপ করে গেল। 'এদের মিথ্যা অহংকার। যে মাটির ওপর তোমরা বড় হলে, কই সেই মাটি তো কখনও অহংকার করেনি'। দুর্বা মনে মনে কথাগুলো ভাবতে লাগল। কিন্তু বড়দের সামনে বলার মতো তার সাহস ও শক্তি কোনটাই ছিল না। তাই মাথা নত করে চুপ করে থাকল।

এদিকে অহংকারের খেলা আরও জমে উঠল। এমন হল যে সব গাছ তাদের নিজের নিজের কর্তব্য ভুলে গিয়ে নিজেদের মাহাত্ম্য কীর্তনেই ব্যস্ত থাকলো। একমাত্র দুর্বাই তার কর্তব্যে অবিচল। সে জানে তার নরম পাতার ওপর পা দিয়ে মানুষ সকালে হাঁটে, শরীর চর্চা করে। তাই সে তার নিজের দায়িত্ব থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিল না। তার উপর দিয়ে চলাফেরা করতে কেউ যাতে কষ্ট না পায় সেই চেষ্টাই করে যেতে লাগলো। একদিন জঙ্গলে প্রচন্ড ঝড় শুরু হল। ঝড়ের গতি এতই যে বড় বড় গাছগুলি নড়বড় করতে লাগলো। কিন্তু তারা যাতে একে অপরের কাছে ছোট হয়ে না যায়, তাই জোর করে নিজেকে ধরে রাখতে চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু ঝড়ের গতি এতটাই ছিল যে তারা একে একে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। এমনকী বট, অশ্বত্থ-র মতো প্রকাণ্ড বৃক্ষগুলিও ঝড়ের সামনে টিকতে পারল না। একমাত্র দুর্বা অন্যদের মতো মিথ্যা অহংকারের লড়াইতে যোগ না দিয়ে বিনম্রতার সঙ্গে নিজেকে আরও নুইয়ে দিল। ঝড় থেমে যাওয়ার পর দেখা গেল দুর্বা ছাড়া আর কেউ জীবিত নেই।

দুর্বা মনে মনে ভাবতে লাগল অহংকার না করে এরা যদি একটু নিজেদের নুইয়ে দিতো তাহলে এদশা হত না। অহংকারের পরিণতি এই হয়, মৃত্যু।

চিত্রকথা ।। ভক্ত ও ভগবান ।। তের

জীবনে বিজ্ঞান

।। নির্মল কর।।

মোবাইলে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের খবর

শুধু রেডিও, দূরদর্শন মারফৎ নয়, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের খবর এবার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে মোবাইল ফোনেও সম্প্রচারিত হবে। কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-মন্ত্রী কপিল সিবলের দাবি, সারা বিশ্বে একমাত্র ভারতেই প্রথম প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের খবর মোবাইলে সম্প্রচার করে হুঁশিয়ারি দেওয়ার ব্যবস্থা হল। সাধারণ মানুষ ৩০ সেকেন্ডের মধ্যে যে কোনও বিধবংসী প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সংবাদ পেয়ে যাবেন। সতর্কতা জারি হবে ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর থেকে।

স্নায়ুকোষের ক্ষমতা

এতদিন ধারণা ছিল, শুধু স্টেম সেল থেকে জন্ম নেয় মানব শরীরের অন্যান্য কোষ। ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা ইঁদুরের মস্তিষ্কে মানুষের স্নায়ুকোষ প্রতিস্থাপন করে দেখেছেন, সেখানে জন্ম নিয়েছে নতুন স্নায়ু কোষ। হাতে কলমে পরীক্ষা করে এটাই প্রমাণিত হল, স্টেমকোষের পাশাপাশি মানুষের স্নায়ুকোষও অন্যান্য কোষের জন্ম দিতে সক্ষম। গবেষণায় সম্ভব হয়েছে স্নায়ুকোষের বিভাজন। এর ফলে অ্যালঝাইমার্স বা পার্কিনসনের মতো জটিল স্নায়বিক রোগের চিকিৎসাসূত্রও বেরিয়ে আসতে পারে।

জীবাণুর সাহায্যে সোনা নিষ্কাশন

মস্কোর মাইক্রোবায়োলজি ইন্‌স্টিট্যুটের গবেষকরা জীবাণুর সাহায্যে আকরিক থেকে সোনার রেণু নিষ্কাশন করতে সমর্থ হয়েছেন। সোনাযুক্ত আকরিকের দু'টি বিভিন্ন দ্রবণে কয়েক প্রজাতির জীবাণু স্থাপন করে দু'দিন পরে গবেষকরা দেখলেন, উদ্দেশ্য-সাধনে সবচেয়ে কাজের জীবাণু হচ্ছে অ্যাক্টিনোমাইসেস। এই জীবাণু আকরিক ৬ থেকে ৮ শতাংশ পর্যন্ত সোনা আহরণ করতে পারে।

বিপজ্জনক ঘুম

হৃদরোগীদের পক্ষে ঘুম যেমন প্রয়োজন, তেমনি বিপজ্জনকও হতে পারে। ইউনিভার্সিটি হসপিটাল অব ওয়েলসের বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি এক গবেষণায় জেনেছেন, অধিকাংশ রোগী হৃদরোগে আক্রান্ত হন ভোর ৫টা থেকে ৬টার মধ্যে এবং ওই সময়ে মৃত্যুর হারও বেশি। কারণ, ঘুমনোর সময় রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায়। তাই শোবার সময় রোগীদের নাকে অক্সিজেনের নল ঢুকিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন ওয়েলসের হৃদরোগ বিশেষজ্ঞরা।

বীর্য থেকে ক্যান্সার

পুরুষের বীর্যে লুকিয়ে থাকে নতুন প্রাণের যে-বীজ, সেই বীর্যই কিন্তু ডেকে আনতে পারে প্রাণঘাতী ক্যান্সার। বীর্যে হরমোনের মতো এক ধরনের অণুর উপস্থিতিই মেরুদণ্ডের কর্কটরোগের জন্য দায়ী বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। এই ক্যান্সারের পেছনে রয়েছে যে হিউন্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস, তার ওপরেই নাকি অনুঘটকের কাজ করে প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন নামে ওই জৈব অণু। তবে ইংল্যান্ডের ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ জন টয় আশ্বাস দিয়েছেন, অরক্ষিত যৌন সংসর্গের ফলে এই ক্যান্সার ছড়ানোর সম্ভাবনা নেই ।

Ganesh Raut (B.Com)
Govt. Authorised Agent **L.I.C.I.**
Contact For Better Service
2521–0281, 94323–05737

MANGALAM RICE MILL (P) LTD.
Khudkuri, Sankari,
Ps KhandaGhosh
Burdwan.
Best Quality Rice Manufacturer

আস্থা ভোট এবং সি পি আই (এম)-এর সঙ্কট

ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর গত চার বছর ধরে কর্তৃত্ব করার পর হঠাৎ সি পি আই (এম) এবার একেবারে বেকায়দায় পড়ে গিয়েছে। কংগ্রেস পরিচালিত ইউ পি এ গোষ্ঠী এক মিলিজুলি সরকার গঠন করলেও গরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি, তাকে অসহায়ভাবে নির্ভর করতে হয়েছে বামদলগুলোর সমর্থনের ওপর। সি পি আই (এম), সি পি আই, ফরোয়ার্ড ব্লক ও আর এস পি -এই তথাকথিত বামদলগুলো ৫৯ জন সাংসদকে নিয়ে সরকারের পেছনে দাঁড়ানোর ফলে তাদের পক্ষে চার বছর ধরে সরকার চালানো সম্ভব হয়েছে। বামেদের বলা হত ইউ পি এ সরকারের প্রাণভোমরা। প্রধানত সি পি আই (এম)-দল মনে করত, তারা সরে গেলেই সরকারের পতন ঘটবে — এই বিশ্বাসে দলীয় নেতারা ক্রমাগত সরকারকে চাপ দিয়ে চলেছিলেন আর ক্ষমতা লোভী কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ মধুভাণ্ডারটা আগলে রাখার তাগিদে তোষামোদ করে চলেছিল বামপন্থী নেতাদের। অনেক স্বঘোষিত মার্কসবাদী নেতা সগর্বে বারবার বলেছেন — তাঁরা যেভাবে চালাবেন, মনমোহন সরকার সেভাবেই চলতে বাধ্য।

বেড়ালকে ভয় দেখিয়ে পেছনে সরাতে সরাতে দেওয়ালে ঠেলে ধরলে তখন নাকি সে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ায়। এক্ষেত্রেও বোধ হয় সেটাই ঘটেছে। মনমোহন সরকারের অসহায়তা ও ক্লীবতা লক্ষ্য করে সি পি আই (এম) জমি দখল সংক্রান্ত আইন সংশোধনের ব্যাপারে আপত্তি জানিয়েছিল, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে চালিয়েছিল নিষ্ঠুর বর্বরতা, নিয়েছিল অন্যান্য সুযোগ-সুবিধেও। মাঝে মাঝে সমর্থন তুলে নেওয়ার ভাব-ভঙ্গিও দেখিয়েছিল। কিন্তু এবার পরমাণু চুক্তি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার হঠাৎ দৃঢ়তা দেখানোর ফলে সি পি আই (এম)-এর সব পরিকল্পনা ভেস্তে গিয়েছে, ছিন্ন হয়ে গিয়েছে দুর্দিনের গাঁটছড়া। এই দল এখন এক অভাবিত ও করুণ অবস্থার মুখোমুখি হয়েছে হিসেবের ভুলে।

এই পরমাণু চুক্তির ভাল-মন্দের দিকগুলো আমার মতো স্বল্প শিক্ষিত ব্যক্তির বোঝার কথা নয়। তবে এটা স্পষ্ট যে, এই চুক্তি সম্পাদন করলে ভারত পারমাণবিক প্রকল্পের জন্য ইউরেনিয়াম আনতে পারবে বিদেশে থেকে, তার বিদ্যুৎ শিল্পের সমৃদ্ধি হবে, শিল্পায়নে গতি আসবে এবং স্বনির্ভরতা বেড়ে যাবে। বিশেষ করে, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ও বিশিষ্ট পরমাণু-বিজ্ঞানী ডঃ এ পি জে আব্দুল কালাম এবং পরমাণু শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান ডঃ অনিল কাকোদকর যেহেতু জানিয়েছেন যে, এটা দেশের পক্ষে হিতকর, তার ফলে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের ধারণা হয়েছে—এই চুক্তিটা সম্পাদন করা দরকার। এর ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়ে আলোচনা আরও করা যায়, ভবিষ্যতে তার সংশোধনের প্রয়াসও চালানো যায়।

কিন্তু মূলত চীন ও পাকিস্তানের স্বার্থে সি পি আই (এম) ও তথাকথিত বামদলগুলো এর বিরুদ্ধতা করেছে, মার্কিন চাপের উল্লেখ করেছে, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রসঙ্গও টেনে এনেছে— যেন তারা সত্যিই দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন। সি পি আই ও সি পি আই (এম)-এর নীতি হল 'Opposition to imperialism, especially American imperealism' (ডঃ এ সি কাপুর — দ্য ইণ্ডিয়ান পলিটিকেল সিস্টেম, পৃঃ ৪৪৫) কিন্তু, চীন যখন ১৯৫০ সালে তিববত দখল করে ভারত সীমান্ত ছুঁয়েছে বা ১৯৬২ সালে ভারতকে আক্রমণ করেছে, অবিভক্ত সি পি আই তার মধ্যে খারাপ কিছু দেখেনি, সাম্রাজ্যবাদের গন্ধও পায়নি। পাকিস্তান মার্কিন দোসর হয়েও নিছক ভারত-বিদ্বেষের কারণে চীনের সঙ্গে দোস্তি করেছে, পারমাণবিক প্রস্তুতিও নিয়েছে। আত্মরক্ষার তাগিদে ভারত পোখরানে পরমাণু প্রস্তুতি সফল করার পর সি পি আই (এম) তার বিরোধিতা করেছে, আবার শান্তি শান্তি করে গলাও ফাটিয়েছে। একচক্ষু হরিণের মতো সে শক্তি হিসেবে দেখতে পেয়েছে আমেরিকাকেই। হঠাৎ দেশপ্রেমিক সেজে দলীয় দলীয় নেতারা মনমোহন সরকারকে এবার আমেরিকার সঙ্গে পরমাণু চুক্তি করার ব্যাপারে নিষেধ করেছে, বারবার সরকারকে ফেলে দেওয়ার 'ব্ল্যাক্‌মেলিং'-কৌশল নিয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত গত ৯ জুলাই অন্য তিনটে বাম-দলের সঙ্গে সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছে।

আস্থা ভোটের জন্য ডাকা লোকসভার অধিবেশন ঃ ২১ জুলাই ২০০৮

তার হিসেবটা ছিল এই রকম — সমর্থন তুলে নেওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলে সরকার পড়ে যাবেই, কারণ সংবিধানের ৭৫ (৩) নং অনুচ্ছেদ অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারকে লোকসভায় গরিষ্ঠতা রাখতেই হয়। সরকার যদি গরিষ্ঠতা দেখাতে না পারে তাহলে তাকে পদত্যাগ করতে হয় — এটা সংসদীয় রীতি তো বটেই, সাংবিধানিক বিধিও। (ডঃ বি সি রাউত — ডেমোক্রটিক কন্‌ষ্টিটিউশান অফ ইণ্ডিয়া, পৃঃ ১৫২)। প্রধানমন্ত্রী যদি বোঝেন যে, আস্থা বা অনাস্থা ভোটে তাঁর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, তাহলে তিনি আগেভাগেই পদত্যাগ করতে পারেন। এভাবেই মোরারজী দেশাই ১৯৭৯ সালে, চরণ সিং ১৯৭৯ সালে, চন্দ্রশেখর ১৯৯১ সালে, অটলবিহারী বাজপেয়ী ১৯৯৬ সালে এবং ইন্দ্রকুমার গুজরাল ১৯৯৮ সালে বিদায় নিয়েছেন। আর যদি এই ধরনের ভোটে তাঁর পরাজয় ঘটে তাহলে তাঁকে পদত্যাগ করতেই হয় — ভি পি সিং, দেবগৌড়া ও বাজপেয়ী (দ্বিতীয়বার) সরে গিয়েছেন এভাবেই। এই কারণে ডঃ সুভাষচন্দ্র কাশ্যপ বলেছেন, 'The excutive remains responsible to parliament' (আওয়ার কন্‌ষ্টিটিউশান, পৃ ঃ ১৮৩)। আসলে, এটা হয়েছে বৃটিশ 'মডেল' গ্রহণ করার ফলে। আমরা ক্যাবিনেটকে আমেরিকার মতো রাষ্ট্রপতির কাছে দায়িত্বশীল করিনি — বৃটেনের ধাঁচে আমাদের সরকারও দায়ী লোকসভার কাছে। ডাঃ এম ভি পাইলীর ভাষায় — The constitution has adopted the British model of cabinet System of responsible government' — (অ্যান্ ইন্ট্রোডাকশন টু দ্য কন্‌ষ্টিটিউশান অফ ইন্ডিয়া পৃঃ ১৬৭)। কিন্তু সি পি আই (এম) নেতারা কতকগুলো মারাত্মক ভুল করেছেন।

প্রথমত, তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন যে, ৫৯ জন বাম সাংসদ সমর্থন তুলে নেওয়ার ভয় দেখালে পাঁচ বছর ধরেই সরকার ভীরুর মতো বাধ্য হয়ে থাকবে। ক্রমাগত চাপের মধ্যে থাকতে থাকতে শেষে বিরক্ত হয়ে, প্রধানমন্ত্রী এবার বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এটা বাম নেতারা ভাবতেই পারেননি।

দ্বিতীয়ত, তাঁদের ধারণা ছিল তাঁরা সরে গেলেই সরকার পড়ে যাবে। তাঁদের এই হিসেবটাও ছিল ভুল। এতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ভারতীয় রাজনীতির চরিত্রই তাঁরা বোঝেননি। তাঁদের সঙ্গে আছেন ৫৯ জন। কিন্তু সরকারকে পরাজিত করার জন্য দরকার ছিল অন্তত ২৭২ জনের সমর্থন। দলীয় বা গোষ্ঠীগত হিসেব ঠিক থাকলে সরকারের পক্ষে থাকতো ২৬৩ জন, দল ভাঙতে পারলে বা ক্রশ ভোটিং ও হর্স ট্রেডিং-এর ফলে এটা যে বাড়তে পারে — পূর্বোক্ত নেতারা সেটাও বোঝেননি। ভারতীয় রাজনীতিতে তত্ত্ব, আদর্শ, নীতি শৃঙ্খলা কোনটাই কিছু নয়, বড় জিনিষ হল স্বার্থবোধ, অর্থ-লালসা। প্রতিপত্তি বিস্তার ও ক্ষমতা প্রাপ্তির হিসেব। এর ফলে আস্থা ভোটের আগে এক ন্যক্কারজনক, ঘৃণ্য ও নোংরা খেলা চলেছে। অন্তত ১৭ জন সাংসদ দলীয় শৃঙ্খলা ভেঙে ভোট দিয়েছেন, কয়েকজন অনুপস্থিত থেকেছেন বা ভোট দেননি। ভোট দেবার জন্য, না থাকার জন্য এবং ভোটদানের বিরত থাকার জন্য চলেছে চক্রান্ত, গোপন বৈঠক ও অর্থের লেনদেন। পরমাণু চুক্তিটা বড় কথা হয়ে ওঠেনি—কেউ চেয়েছেন পৃথক রাজ্য, কেউ চেয়েছেন উচ্চতর পদ। তার ফলে দীর্ঘদিনের মিত্ররা শত্রু হয়েছেন। আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাসীরা জাতপাত-ভিত্তিক দলের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন, ধর্মনিরপেক্ষতার বুলি আউড়েও কেউ কেউ জোট বেঁধেছেন ধর্মাশ্রয়ী দলের সঙ্গে। এই সব কারণে ১৯ ভোটে সরকার জয়ী হয়েছে। ভবিষ্যতের মুনাফার আশায় কর্পোরেট সেক্টরও আসরে নেমে পড়েছিল। দুবাই থেকেই অপারেশনে নেমেছিল দাউদও।

এর ফলে সি পি আই (এম) দলের কোমরই ভেঙে গিয়েছে বলা যায়। এতদিন বন্ধু সরকারকে চাপ দিয়ে প্রচুর সুযোগ সুবিধে আদায় করা গিয়েছিল — কিন্তু বেশি খেতে গিয়ে 'তাঁতী নষ্ট' হল এবার। মুলায়মের সমাজবাদী দল ছিল তাদের সঙ্গে — এবার তাদেরও ঠেলে দেওয়া হয়েছে কংগ্রেস শিবিরে — মায়াবতী, তেলেগু দেশম, এম ডি এম কে ইত্যাদিকে নিয়ে এর পরে বামেরা নির্বাচনের বৈতরণী পার হতে পারবে? ক্রমে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গেও তার রমরমার দিন ফুরিয়ে আসছে — সম্প্রতি পৌর ও পঞ্চায়েত নির্বাচনে সেটা লক্ষ্য করা গিয়েছে। কেরলে দল দ্বন্দ্ব-বিদীর্ণ হয়ে আছে, ত্রিপুরার আসন মাত্র ২ টো। মনমোহন সরকারকে জব্দ করতে গিয়ে মানও গেল, ধনও গেল।

তৃতীয়ত, দলের ভেতরের সংঘাতটাও যেন এবার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দলীয় নেতাদের কেউ কেউ মনে হয় চাননি যে, এভাবে সরকারকে চাপ দেওয়া হোক। কোনও কোনও নেতা মুখ খোলায় দলীয় দ্বন্দ্বটা প্রকট হয়ে উঠেছে। প্রবীণ কোন কোন নেতা কি প্রতিশোধ নিতে চেয়েছেন কারাত গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে? নাকি তাঁরা চেয়েছেন সরকারের সঙ্গে থেকে প্রাপ্তির অঙ্কটা বাড়িয়ে নিতে?

চতুর্থত স্পিকারকে নিয়ে বিরোধটা একেবারে নগ্ন রূপে গিয়েছে। দলীয় নেতৃত্ব সমর্থন প্রত্যাহার নিয়ে রাষ্ট্রপতিকে যে চিঠি দিয়েছেন, তাতে দলের ৪৩ জন সাংসদের নাম ছিল। প্রথমেই ছিল স্পিকার সোমনাথ চ্যাটার্জীর নামে। তিনি কিন্তু এতে ক্ষুব্ধ হয়েছেন, কারণ তাঁর বক্তব্য ছিল তিনি যেহেতু সর্বসম্মতিক্রমে স্পিকার হয়েছেন তিনি দলের উর্দ্ধে। সুতরাং দলের ওই ফতোয়া তাঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তার অর্থ হল — তিনি ভোটাভুটিতে দলীয় নীতি মানবেন না, দু'পক্ষের ভোট সমান হলে 'Casting vote' দেবেন।

তিনি অবশ্যই ব্রিটিশ ঐতিহ্য স্মরণ করেছেন। বৃটিশ স্পিকার ওই পদে বসেই দলের বাইরে চলে যাবে। দলের সঙ্গে আর তাঁর সম্পর্ক থাকে না। ১৯৪৫ সালে ক্লিফ্‌টন ব্রাউন স্পিকার হয়ে বলেছিলেন — 'As Speaker, I am not government's man, not the Opposition's man. I am the house of common's man.' শুধু তাই নয় — তিনি আনুষ্ঠানিক ভাবেই দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। অষ্টিন অগ্ লিখেছেন, 'As the speaker he is supposed to have no party connection or prejudicess — (ইংলিশ গভর্ণমেন্ট অ্যাণ্ড পলিটিক্স, পৃঃ৩৮২)। তার ফলে পরবর্তী নির্বাচনে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী থাকেন না এবং কমন্সসভায় ফিরে গেলেই তাঁকে বিনা বাধায় পুনর্নির্বাচিত করা হয়। অগ্ লিখেছেন, 'He never attends a party meeting'। তাই পরবর্তী ক্ষেত্রে তাঁর নির্বাচনটা হয়ে ওঠে নিছক একটা স্বাভাবিক ব্যাপার — বাইরে ভেতরে তাঁকে বিরোধিতার সম্মুখীন হতেই হয় না — When a former speaker is to be re-elected, the ceremony in the house is a sheer formality'। কিন্তু সোমনাথবাবু দলীয় সদস্যপদ ছাড়েননি, আর এর পরে তিনি নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফিরে আসতেন কিনা বা সভাকক্ষে অন্য কেউ প্রার্থী হবেন কিনা সেগুলোও অজানা ব্যাপার। সুতরাং তাঁর দল এক্ষেত্রে ভুল করেনি। কিন্তু তিনি দলীয় নির্দেশ না মানায় তাঁকে বহিস্কৃত করা হয়েছে। সুভাষ চক্রবর্তী প্রমুখ নেতা এতে ক্ষুব্ধ — তাঁর রাজনৈতিক গুরু জ্যোতিবাবুও সম্ভবত তাঁর পেছনে আছেন। এই নিয়ে দলে বেশ একটা গন্ডগোল যে দেখা দিয়েছে, সেটা নিয়ে দ্বিমত থাকতে পারে না। সোমনাথবাবুর নির্বাচন কেন্দ্র বোলপুরে তাঁর সমর্থনে বেশ মিছিল, মিটিং হয়েছে — এতেই বোঝা যায় ব্যাপারটা সহজে মিটবে না। ফাটলটা বিস্তৃত হবে আরও। সব মিলিয়ে বলা চলে এই দলের অবস্থা এখন সঙ্গীণ। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে দল প্রায় নিঃসঙ্গ হয়ে গিয়েছে, দলে দেখা দিয়েছে বিরোধ-দ্বন্দ্ব, কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর খবরদারি করার দিন ফুরিয়েছে আর তার লালদুর্গ পশ্চিমবঙ্গেও প্রকট হয়েছে ভাঙনের চিহ্ন।

নেতারা এখনও অশনি সঙ্কেত দেখতে পাচ্ছেন না?

সকল প্রকার স্টীল ফার্নিচারের জন্য যোগাযোগ করুন
Dass Steel Co.
Mirchak Road. - Malda
Ph. No. 266063

ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়,
রোদ বৃষ্টিতে কিসের ভয় !
অক্ষয় কুমারপালের ফোল্ডিং ছাতা
বড়বাজার,কলকাতা-৭০০ ০০৭,
ফোন ঃ ২২৪২৪১০৩

বিগত ৬০ বছর ধরে দেশ-শত্রুদের ক্রমবর্ধমান দেশদ্রোহিতা এখনই কঠোর হস্তে দমন না করলে, অচিরেই খণ্ডিত ভারত শত্রু-কবলিত হবে। এই নির্মম সত্যটি উপলব্ধি করার জন্যে
ফা হিয়েনের 'বিলুপ্তির পথে হিন্দু' - ১৫০্
প্রিয়রঞ্জন কুণ্ডুর 'হিন্দুর শত্রু হিন্দু'-৬০্
শীর্ষক পুস্তক দুটি বিশেষভাবে সহায়ক হবে।
◆ দে বুক ষ্টোর-কলেজ স্ট্রীট ◆ সর্বোদয় বুক ষ্টল, হাওড়া ষ্টেশন

সংস্কার ভারতী-সিউড়িশাখার নটরাজ পূজন উৎসব

সংস্কার ভারতী সিউড়ি শাখার উদ্যোগে উদযাপিত হল নটরাজ পূজন উৎসব। গত ২০ জুলাই-এর এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন যদুপতি দত্ত।

নটরাজ পূজা দিবসের অন্যতম অঙ্গ হিসেবে সংস্থার পক্ষ থেকে সম্মান জ্ঞাপন করা হয় বিশিষ্ট আলোকচিত্রী তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সম্মান পেয়ে তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ভারতীয় পরম্পরার

নটরজা পূজা দিবস অনুষ্ঠানে শিল্পীরা সমবেত গীত গাইছেন।

সমাবেশ সমাচার

ধারক হিসাবে গুরু পূর্ণিমায় নটরাজ পূজন উৎসব পালন ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিশিষ্টদের গুরুর আসনে বসিয়ে সম্মান প্রদান এক ভারতীয় কৃষ্টির সাক্ষ্য বহন করে।

সভানেত্রী স্বপ্না চক্রবর্ত্তী উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন তিলক সেনগুপ্ত।

নটরাজ বন্দনা

হুগলী জেলার সংস্কার ভারতীর উত্তরপাড়া শাখার উদ্যোগে গত ১৯ জুলাই স্থানীয় বাণীসভা হলে নটরাজ বন্দনা (গুরু পূর্ণিমা) উৎসব পালিত হল। দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রাদেশিক সহ সভাপতি দেবাশীষ ভট্টাচার্য তাঁর বক্তব্যে বিকৃত সংস্কৃতির গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে সজাগ করার পাশাপাশি সুস্থ সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিস্তারে জোর দেন। অনুষ্ঠানে শান্তিনিকেতন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সঙ্গীত শিক্ষক সুনির্মল ভট্টাচার্যকে পঞ্চ ফল ও উত্তরীয় দিয়ে বিশেষ সম্বর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানের শেষে গুরুর মহিমার ওপর বর্ণিত 'উত্তরণ' নামে একটি শ্রুতি নাট্য পরিবেশিত হয়।

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উঃ দিনাজপুর জেলার দানগ্রাম শাখার স্বয়ংসেবক অজয় কুমার চৌধুরী গত ৪ মে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি তিনপুত্র, পত্নী ও নাতি-নাতনীদের রেখে গেছেন।

❁ ❁ ❁

উত্তর দিনাজপুরের দুর্গাপুর খণ্ডের স্বয়ংসেবক গৌতম থোকদারের পিতা গিরীশচন্দ্র থোকদার গত ৯ জুলাই পরলোক গমন করেছেন।

❁ ❁ ❁

সংস্কার ভারতীর উত্তর কলকাতা শাখার প্রাক্তন সঙ্গীত সম্পাদিকা শ্রবণা চট্টোপাধ্যায় (রায়) গত ২৫ জুলাই অল্প বয়সে পরলোক গমন করেন। গত ১ আগস্ট কলকাতায় অনুষ্ঠিত এক স্মরণ সভায় সংস্কার ভারতীর পক্ষ থেকে তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করা হয়।

❁ ❁ ❁

উত্তর দিনাজপুর জেলার হাসুয়া সমাধি মঠের সন্ন্যাসী শুদ্ধ প্রকাশ অরণ্য মহারাজ গত ২৭ জুলাই ইহলোক ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর।

শুরু হচ্ছে সংস্কৃত শিক্ষক প্রশিক্ষণ বর্গ

সংস্কৃত ভাষাকে জনমুখী করার উদ্যোগ নিল সংস্কৃত ভারতীর পশ্চিমবঙ্গ শাখা। বর্গের আহ্বায়ক গোপাল পঞ্চ তীর্থ জানিয়েছেন, আগামী ২১ থেকে ৩১ আগষ্ট পর্যন্ত উত্তর ২৪ পরগণা জেলার হালিশহর নিগমানন্দ সারস্বত মঠে, সংস্কৃত সম্ভাষণ শিক্ষক শিবির হবে। এই বর্গে ছাত্রদের জন্য শুল্ক রাখা হয়েছে৩৫০ এবং উপার্জনশীলদের জন ৫৫০ টাকা। একদিকে যেমন সংস্কৃতে কথা বলা এবং ব্যাকরণগত দিক সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, অন্যদিকে ব্যক্তিত্ব বিকাশ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ইত্যাদি সম্পর্কেও শিক্ষাদান করা হবে। যোগাযোগের জন্য ৯৮৩৬২৯৮৬৭৯, ৯৮৩১৪৬৩৫৩৯, ৯৪৩৩৯১৫২৭২ নম্বরে কথা বলা যেতে পারে।

হিন্দু মহাসভার ধিক্কার

বিভিন্ন রাজ্য ইসলামি সন্ত্রাসবাদের আক্রমণের তীব্র ধিক্কার জানাল বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা। অপরাধীদের চিহ্নিত করে উপযুক্ত শাস্তির দাবির পাশাপাশি সরকারের ভোটের স্বার্থে ভারতকে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়ার জন্য কেন্দ্র সরকারের কঠোর সমালোচনা করছে হিন্দু মহাসভা। এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে তাদের অভিযোগ, স্বাধীনতার ৬০ বছরেও কোনও আলোচনাই ভারতে সাম্প্রদায়িক শান্তির আলো দেখাতে পারেনি। মহাসভার মতে, একমাত্র শক্তিশালী ও শত্রুর প্রতি কঠোর মানসিকতাসম্পন্ন ভারতই শান্তির পথ দেখাতে পারে। বর্তমান কংগ্রেস পরিচালিত ইউপিএ সরকারের নরম মনোভাবেরও সমালোচনা করেছে হিন্দু মহাসভা।

শব্দরূপ - ৪৭৭

অনুপ দাস

১	■	■	২		৩		■
	■	■		■		■	■
৪	৫			■	৬	৭	
■		■	■	■	■		■
■		■	■	■	■		■
৮		৯	■	১০			১১
■	■		■		■	■	
■	১২				■	■	

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ২. এই ব্যক্তিত্বের আসল নাম মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল, মধ্যে পুজোর বেদিকা, ৪. গলে যাওয়ার অবস্থা, তরল অবস্থা প্রাপ্তি, ৬. "— কারো হাতে ধরা নয়, ৮. বসবার উপকরণ, ১০. আত্মীয় স্বজন, নিজের লোক, ১২. মাছ, কুমীর, তিমি এই ধরনের প্রাণী।

উপর-নীচ ঃ ১. প্রতিশব্দে অশিষ্ট, অভব্য, ২. অন্য শব্দে প্রাণহীন, ম্রিয়মাণ উদ্যমহীন, নিষ্প্রাণ, ৩. যদিও রজনী পোহাল তবুও — কেন যে এলো না এলো না, ৫. প্রতিশব্দে অতি কদর্য, অতিশয় ঘৃণ্য, বিকৃত, ৭. যাঁর স্মৃতিতে তাজমহল তৈরি হয়েছে, ৯. চতুর্থ পাণ্ড ব, ১০. চোদ্দ অক্ষরের বাংলা ছন্দ বিশেষ, ১১. বিনয়ে নত, শান্ত, শিষ্ট।

সমাধান শব্দরূপ ৪৭৫

সঠিক উত্তরদাতা

শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
ভরত কুন্ডু
কলকাতা-৬
লক্ষ্মণ বিষ্ণু
সিউড়ী, বীরভূম।

বৈ	■	■	বে	বি	ফু	ড	■
দি	■	■	সি	■	চ	■	■
ক	মি	শ	ন	■	কা	মা	খ্যা
■	ক্সা	■	■	■	■	ছি	■
■	চা	■	■	■	■	ম	■
গৌ	র	ব	■	হ	স্তী	শা	লা
■	■	ল	■	ন	■	■	য়
■	ম	হা	জ	ন	■	■	লা

● এই সংখ্যার সমাধান আগামী ১ সেপ্টেম্বর ২০০৮ সংখ্যায়।

ভারত বৈরীতার উৎসসন্ধানে

(৩ পাতার পর)

হয়। তৎকালীন কাশ্মীরের স্বাত্অঞ্চ ল থেকে আসা ভারতীয় পন্ডিত পদ্মসম্ভব-এর নেতৃত্বে ভারতীয় পন্ডিতরা চীনা পন্ডিতদের পরাজিত করেন এবং চীনা মাওবাদ চিরকালের জন্য তিববত থেকে নির্বাসিত হয়। এই পদ্মসম্ভবের (পাঞ্চে ন) দ্বারাই তিববতের প্রথম মঠ সমোয়াতে স্থাপিত হয় এবং সাতজন সন্তের নিয়োগ ব্যবস্থা চালু হয়। তিববতীরা পদ্মসম্ভবকে গুরু রিমপোচে বলে জানে। এই আজকের চীনেও সেই অতীত ভারত-বিদ্বেষের বিষ চীনা শাসকদের প্ররোচিত করেছে।

গত মে, ২০০৭-এ সামেয়া মঠের সামনে স্থাপিত পদ্মসম্ভবের ৩০ ফুট উঁচু মূর্তিকে তারা ধ্বংস করে দেয়। তিববতী জাতি সত্ত্বাকে বিনষ্ট করার বৃহত্তর পরিকল্পনারই অঙ্গ এটি। আর যে ক'জন ভারতীয় পন্ডিতদের অবদান আছে তিববতী জীবনধারায় তাঁরা হলেন শান্তরক্ষিত এবং কমলাশীল, এবং বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন অতীশ দীপঙ্কর, ৮৩৮ খৃস্টাব্দে রাজা লংদারমার সময়ে পুরানো বন ধর্মের পুনরুত্থান হয় ও বৌদ্ধ ধর্ম গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। পরে নালন্দার বাঙালী অতীশ দীপঙ্কর এবং তিববতী -পন্ডিত রিনচেন সাংপোর প্রচেষ্টায় বৌদ্ধ ধর্ম আবার তিববতে প্রধান ধর্ম হয়ে যায়। বস্তুত পক্ষে বর্তমান তিববতীদের বৌদ্ধ ধর্মের যে রূপ তা অতীশ দীপঙ্করের দেওয়া এই সময়ই তন্ত্রমত ও ধর্মীয় জীবনের অঙ্গীভূত হয়। ভারতীয় যোগও দীপঙ্করের জন্য বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। চীনাদের রাগের কারণ এটাও। তাই তিববতীদের ধার্মিক জীবনের ধারাকে ধ্বংস করার সব প্রয়াসই চীনা কর্তৃপক্ষ নিয়েছে। যুক্তি এবং নৈতিকতা হারিয়ে গেলে ক্ষিপ্ততাই একমাত্র অবলম্বন হয়, তিববতকে গ্রাস করার জন্য সেই ক্ষিপ্ততাই চরমতম আকার নিয়েছে অলিম্পিকের আগে। তিববতিদের পরম শ্রদ্ধেয় দলাই লামার সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য এই ক্ষিপ্ততার কারণেই বিভেদকামী সর্প মস্তকযুক্ত নরমাংসভোজী সাধুর বেশে নেকড়ে বাঘ...মানব মুখ যুক্ত শয়তান...ধূর্ত শেয়াল প্রতিক্রিয়াশীল পাশ্চাত্য ষড়যন্ত্রের হাতিয়ার ইত্যাদি।

সেই একই নেহরু নীতি— মনমোহন সিংয়ের সঙ্গে হু-জিনতাও।

কারণ ইতিহাস তিববতকে চীনের অঙ্গ বলে স্বীকার করে না বলেছেন চীনের অভ্যন্তরেই ফুদান বিশ্ববিদ্যালয়ের (মসাংহাই) ডিরেক্টর জে জয়ানজং ঐতিহাসিক এবং চীনের ইতিহাস ভূগোল পাঠ্য পুস্তক কমিটির উপদেষ্টা সরকারি ঐতিহাসিকরা বলেন ১৮৭৮ সাল চেফু চুক্তিতে বৃটিশ কর্তৃক তিববত অভিযানের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করাই তিববতের স্বাধীন অস্তিত্বের অসারতা প্রমাণ করে। তাহলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে তিববতের মধ্য দিয়ে সৈন্য চলাচলের জন্য চীন-মার্কিন যৌথবাহিনীর তিববত সরকারের অনুমোদন চাওয়া এবং অনুমতি না পাওয়াটা মেনে নেওয়া কীসের ইংগিতবহ? ১৯৫৯ সালের International Jurist-দের সিদ্ধান্ত কী?

রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য কেউ কেউ বলেন যে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার কোন দাবিও তিববত করেনি চীন কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার আগে। একটা দেশ তার মত চেষ্টা করেছিল — থাকতে চেয়েছিল তার নিজস্ব জাতিসত্তা, ভাষা, সংস্কৃতি প্রশাসনিক বৈশিষ্ট্য সহ, সেটা কি তার অপরাধ। তার জন্য তাকে পীড়ন শোষণ অত্যাচার সয়ে সয়ে নিশ্চিহ্ন হওয়ার জন্য দিন গুণতে হবে? মায়া, আজটেক, ইনকা সভ্যতার মত! ৭৯২ খৃষ্টাব্দে উদ্ভূত ভারত বিদ্বেষ পরবর্তী কালে এম এন রায় এবং সর্বশেষে নেহরুকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করেছে। ১৯২৮ সালে জন জেকবস তাঁর বোরুদিন সম্পর্কিত বইটিতে চীনের ভারত বিদ্বেষের বিশ্লেষণ করেছেন। অনুরূপ বিশ্লেষণেই মানবেন্দ্রনাথ নেহরুকে সাবধান করেছিলে....নেহরু যে চোখে চীনা কমিউনিজম কে দেখছেন তাতে তিনি ভুল করছেন এবং এর দ্বারা তাঁরই সমর্থনে চীনের দ্রুত শক্তি সঞ্চ য়ের সুবিধা হবে মাত্র। তাতে কি ভারত কি এশিয়ার অন্যান্য দেশ সকলের পক্ষেই সমূহ বিপদ। নেহরু যা চাইতেন কমিউনিস্ট চীনের সঙ্গে ভারতের মৈত্রী বন্ধন — তা হবে না। কারণ এশিয়ার নেতৃত্বের জন্য মাও-সে তুঙও কম ব্যস্ত নয়, এবং এও সে জানে যে ভারতকে মারতে না পারলে এটা সম্ভব নয়। সেই কারণে কমিউনিস্ট চীনকে নেহরুর বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করা উচিৎ নয়।"

আজ দেখছি অন্যান্য দেশগুলির সাথে চীন সীমান্ত বিরোধ মিটিয়ে নিয়েছে, অথচ চীন ভারতের সাথে বিরোধ বাড়িয়েই চলেছে। ভারতকে মারার চেষ্টায় সে ধীর কিন্তু নিশ্চিত প্রস্তুতি নিয়েই চলছে— কিন্তু ভারত নেহরু নীতিতেই আটকে থেকে দেশকে সর্বনাশের কিনারায় নিয়ে যাচ্ছে এখনো।

প্রতিরক্ষা দপ্তর আছে — কিন্তু প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের হস্তক্ষেপে পঙ্গু। বিদেশ দপ্তর আছে — কিন্তু শত্রুপক্ষের অনুপ্রবেশে, সীমান্ত লঙ্ঘনে তা তীব্র প্রতিবাদ জানানোর দপ্তর মাত্র।

চীন থেকে ফেরার সময় হ্যানকাও রেল স্টেশনে, ১৯২৭। ডান দিক থেকে দ্বিতীয় এম এন রায়, চতুর্থ রুশ জেনারেল গ্যালেন (ব্লুশের), পঞ্চ ম লু গাইসলার।

স্বরাষ্ট্র দপ্তর আছে কিন্তু তা মন্ত্রকের নির্দেশে জঙ্গি আক্রমণকে নিন্দা করার দপ্তর, ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দপ্তর, অপরাধী ধৃত জঙ্গিদের শাস্তি রূপায়ণ প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত করার দপ্তর মাত্র। দুর্ভাগ্য দেশবাসীর। তার সার্বিক নিরাপত্তা গৌণ মাত্র!

তথ্যসূত্র ঃ

(1) The Chinese Betrayal : B. N. Malik. C.B.I (Ex Dir)

(2) Borodin Stalins man in China : D, JacaBs H.U.Press 1981

(৩) মানবেন্দ্রনাথ ও আন্তর্জাতিক কমিউনিজম ঃ সমরেন রায়

(৪) M.N.Roy's Mission to china 1963, Robert C. North and Xenia Eudian.

(লেখক বাঁকুড়া খৃস্টান কলেজের পদার্থবিদ্যার অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক)

পাক-মহিলারাও জঙ্গিদের সঙ্গে যুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। আল কায়েদার সঙ্গে যুক্ত থেকে মার্কিন সেনা ও এফ বি আই কর্মীদের উপর আক্রমণ ও ষড়যন্ত্র করার অপরাধে পাক মহিলা আফিয়া সিদ্দিগীকে গ্রেপ্তার করে আমেরিকায় চালান করে দিল মার্কিন সেনা। এই ঘটনা সম্প্রতি ঘটেছে। আফিয়া মূলত পাকিস্তানী হলেও উচ্চশিক্ষিতা এবং আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস্বাসী নিউরো সায়েন্টিস্ট। ২০০৩ সালের মার্চ মাসে আমেরিকা প্রবাসী বছর ৩৬-এর আফিয়া করাচীতে বাবা মাকে দেখতে এসেছিলেন। তারপর তার আর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। গত ১৭ জুলাই আফিয়া আফগানিস্তানে গজনীর গভর্ণরের অফিসের বাইরে মার্কিনদের হাতে ধরা পড়েন। তাঁকে সোজা আমেরিকা চালান করা হয়েছে। তাঁর হাতব্যাগে বোমার মসলা ও ফর্মুলা পাওয়া গিয়েছে। ধরা পড়ার সময় দু'রাউন্ড গুলি চালালেও আফিয়া কাউকে মারতে পারেনি।

স্বস্তিকা

পুজো সংখ্যা ঃ ১৪১৫

সৃজনশীল রচনায় পরিপূর্ণ
এক অসামান্য পরম্পরার পুষ্পাঞ্জলি

চারটি মনোমতো উপন্যাস, অনেক ছোট গল্প, রম্যরচনা এবং নানা ভাবনায় সমৃদ্ধ নানা স্বাদের প্রবন্ধগুচ্ছ

—ঃ লিখেছেন ঃ—

সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত, কণা বসুমিশ্র, শেখর বসু, রমানাথ রায়, গোপালকৃষ্ণ রায়, দীপঙ্কর দাশ, সজল দাশগুপ্ত, সুমিত্রা ঘোষ, মানবেন্দ্র পাল, এষা দে, জিষ্ণু বসু, চণ্ডী লাহিড়ী, কে এস সুদর্শন, রাধ্যেশ্যাম ব্রহ্মচারী, তথাগত রায়, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ রায়, প্রসিত রায়চৌধুরী, দীনেশচন্দ্র সিংহ, সুবীর ভৌমিক, প্রীতি মাধব রায়, গুরুপদ শাণ্ডিল্য, নৃপেন আচার্য প্রমুখ।

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হচ্ছে

দাম চল্লিশ টাকা

প্রকাশের পথে

ছেচল্লিশের দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে সুবৃহৎ ঐতিহাসিক উপন্যাস
নীলগ্রীব সিংহ'র

সরওয়ারের তলোয়ার

নোয়াখালির পটভূমিকায়
প্রেম-প্রীতি-মানবিকতা-বর্বরতা—নৃশংসতার এক অসাধারণ আলেখ্য

অমৃত শরণ প্রকাশন, বিদ্যাসাগর রোড, কলকাতা-১২৬,
ফোন-২৫৪২ ৪৩১৯

Swastika
18 August - 2008, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registered No. SSRM/Kol. RMS/W.B./RNP - 048/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
L.No. MM&P.O. - SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-021/2007-09

নিষিদ্ধ সিমি বিভিন্ন নামের আড়ালে এখনও সক্রিয়

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সিমি (স্টুডেন্ট ইসলামিক মুভমেন্ট অফ্ ইণ্ডিয়া) অন্ততঃপক্ষে পঞ্চাশটি আলাদা নামে একই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ভারতে ৩৪টি নিষিদ্ধ সংস্থার মধ্যে রয়েছে সিমি। লালু-মুলায়ম্-এর মতো সর্বভারতীয় নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং তাদের সংশ্লিষ্ট দলও সিমি-র প্রতি সমর্থন প্রকাশেই ব্যক্ত করেছেন। সারা ভারতের মানুষ দূরদর্শনের মাধ্যমে সিমির পক্ষে লালুপ্রসাদ ও-মুলায়মের সমর্থনের বহরও প্রত্যক্ষ করেছেন। ফলে বেশীর ভাগ মানুষের ধারণা সিমিকে পরোক্ষভাবে কেন্দ্রই মদত দিচ্ছে। সরকারি স্তরেই নির্দিষ্ট হয়েছে, সিমির কম করেও চারটি আনুষঙ্গিক সংগঠন সারা ভারত জুড়ে কাজ করে চলেছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক তাদের নিষিদ্ধ তালিকাভুক্ত করেনি বা করতে ব্যর্থ হয়েছে। ওই চারটি সংস্থার নাম হল — তেহরিক-এ-এহয়া-এ-উম্মত, তেহরিক-তালাবা-এ-আরাবিয়া, তেহরিক তাহাফুজ-এ-শহরি ইসলাম এবং ওহাদাত-এ-ইসলামি। ওই নিষিদ্ধ চৌত্রিশটি সংগঠনের তালিকায় এদের কারোর নামই নেই। গত মে মাসেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক নিষিদ্ধ সংস্থার তালিকা আপ ডেট করেছে।

কথা হল, শুধু এই চারটি সংগঠনই সিমির হয়ে বকলমে কাজ করছে এমনটা নয়। আরও ৪৬টি একই ধরনের সংগঠন আটটি রাজ্যে সক্রিয়ভাবে সিমিরই কাজ করে যাচ্ছে। এরমধ্যে তহবিল সংগ্রহ, ক্যাডার সংগ্রহ এবং উগ্র ইসলামি মতাদর্শের সাহিত্য প্রচার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ওই ৪৬টি সংগঠনের মধ্যে শুধুমাত্র কেরলেই ২৩টি ইসলামি সংস্থা সক্রিয়, মহারাষ্ট্রে আটটি, পশ্চিমবঙ্গে সাতটি, বিহারে তিনটি, উত্তরপ্রদেশে দুটি। এছাড়া মধ্যপ্রদেশ কর্ণাটক দিল্লীতে একটি করে সংগঠন কাজ করে যাচ্ছে। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে দু-একটি সংগঠন নিষিদ্ধ হলেও তারা নিষেধাজ্ঞা বা নিয়ন্ত্রণের কোনওরকম তোয়াক্কাই করে না। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের একজন উচ্চপদস্থ অফিসারের মতে রাজ্যের গোয়েন্দা বিভাগ নজর রাখলেও ১৯৬৭ সালের বেআইনী কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে নিষেধাজ্ঞা জারির জন্য পর্যাপ্ত তথ্য প্রমাণ যোগাড়ে তারা ব্যর্থ। গত ৫ আগষ্ট দিল্লী হাইকোর্টের বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বিচারক গীতা মিত্তলকে দেওয়া তথ্যের পশ্চাৎপটে ওই সব সংগঠনের নাম উল্লেখ করা আছে। কিন্তু তিনি নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ আরও বাড়ানোর নোটিফিকেশনে সম্মতি দেননি। পরদিন সুপ্রিম কোর্টে ওই তথ্যই আবার পেশ করা হয় এবং সর্বোচ্চ আদালত ট্রাইব্যুনালের রায়ের উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করে। ওই সংশ্লিষ্ট বিবরণে সিমির বিভিন্ন কার্যকলাপ বিষয়ে বিস্তারিত রয়েছে। বলা হয়েছে, সিমি কোথা থেকে কীভাবে তহবিল সংগ্রহ করে, মুসলমানদের রায়ট বা দাঙ্গা করতে উসকানি দেয়, বিদ্বেষমূলক জেহাদি বক্তব্যের ক্যাসেট এবং সিডি প্রচার করে ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, সিমি এসব মন্তব্যের কোনও তোয়াক্কাই করে না। তাদের কাজ যথারীতি বহাল তবিয়তে চলছে। তাদের ক্যাডার সংগ্রহে বা ক্যাডারদের উদ্বুদ্ধ করাতে কোনও খামতি নেই।

সম্প্রতি আবার এক বড় সংখ্যায় শিক্ষিত মুসলমানরাও সিমিতে ভিড়েছে—তাদের মধ্যে রয়েছে প্রযুক্তিবিদ, চার্টার্ড একাউন্টেন্ট এবং ডাক্তাররাও।

সফদর নাগৌরি-র সঙ্গে ধৃত সিমি-র ১২ জন জঙ্গি

শত জনমের প্রেম

গায়ক গৌরীকেদার ভট্টাচার্যের গানের সিডি-র উদ্বোধন

সংবাদদাতা।। কলকাতা প্রেস ক্লাবে গত ২৯ জুলাই বিকেলে এক সভায় স্বাধীনতা পূর্ব যুগের খ্যাতকীর্তি মরমী দরদী গায়ক গৌরীকেদার ভট্টাচার্য-এর ২১ টি গানের সংকলনের একটি কমপ্যাক্ট ডিস্ক (সি ডি) আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন হল। উদ্বোধন করলেন প্রবীণ শিল্পী দীপালি নাগ।

স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে প্রবীণ শিল্পী ও সুরকার বিমানবিহারী মুখোপাধ্যায় ভট্টাচার্য পরিবারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার কথা বেশ কিছু অশ্রুতপূর্ব প্রসঙ্গের মাধ্যমে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, তাঁর সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর প্রিয় গৌরীদার গান তাঁরই কণ্ঠে তুলে দেওয়ার। তখন এখনকার মতো টেপরেকর্ডারের ব্যবহার ছিল না। স্বর্গীয় গৌরীকেদার ভট্টাচার্য যে সকল গান গেয়েছেন তার মধ্যে দেশাত্মবোধক ও শ্যামাসঙ্গীতই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৫০-এও তাঁর গানের রেকর্ড বের হয়েছিল।

দীপালি নাগ তাঁর স্বল্প বক্তব্যে বলেন, তিনি প্রবাসী বাঙালি। সেজন্য তাঁর সঙ্গে শিল্পী গৌরীকেদার ভট্টাচার্যের ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না। কিন্তু তিনি তাঁর গান শুনেছেন বিলক্ষণ। তাঁর কণ্ঠের শ্যামাসঙ্গীত অসাধারণ। সেখানে ভক্তিগীতি ও শ্যামাসঙ্গীতের পার্থক্য সহজে বোঝা যায়।

বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব বিভাস চক্রবর্তী বলেন, তিনি ছাত্রজীবনে শ্যামবাজারের 'হিন্দু সঙ্ঘ' ক্লাবের জলসায় প্রথম গৌরীকেদার ভট্টাচার্যের গান শুনেছেন, তাঁকে দেখেছেন। রেকর্ড এবং রেডিওতে তাঁর বিভিন্ন গান শুনেছেন। শেষ জীবনে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করে ভোলানন্দ গিরির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। নাম হয়েছিল চন্দ্রশেখর গিরি।

সিডি-র প্রচ্ছদ

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, শিল্পী গৌরীকেদার ভট্টাচার্যের গানের সি ডি তৈরি করেছে 'সা রে গা মা' কোম্পানী। এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা 'সংস্কার ভারতী'। গৌরীবাবুর দুই সুযোগ্য পুত্র শিল্পী বিকাশ ভট্টাচার্য ও সুভাষ ভট্টাচার্য সংস্কার ভারতীর একনিষ্ঠ কার্যকর্তা। ভট্টাচার্যপরিবারের অনেকে এবং তাঁদের আত্মীয় বন্ধুরাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন প্রখ্যাত অভিনেতা এবং সংস্কার ভারতীর প্রাদেশিক সভাপতি ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়।

সভাপতির বক্তব্যে ভিক্টরবাবু বলেন, সংস্কার ভারতী সুস্থ সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে ও ধরে রাখতে সংকল্পবদ্ধ। তিনি বলেন, এদেশের সংস্কৃতি অতি প্রাচীন ও সমৃদ্ধ। আমেরিকার অনুকরণে এখন 'আইডল' সংস্কৃতি চালু হয়েছে মুম্বাইয়ে। সেখানে কমবয়সী কিশোর শিল্পীদেরকে এক্সপ্লয়েট করা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে ভিক্টর ব্যানার্জী প্রয়াত যতীন চক্রবর্তীর প্রয়াসকে সাধুবাদ জানান। তিনি বলেন, স্বর্গীয় গৌরীকেদার ভট্টাচার্য তাঁর এই গানের সি ডি-র মাধ্যমেই অমর হয়ে থাকবেন। এই সি ডি প্রকাশ করার জন্য তিনি 'সা রে গা মা' কোম্পানীকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানান।

এদিনের অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংস্কার ভারতীর রাজ্য সম্পাদিকা নীলাঞ্জনা রায়।

গৌরীকেদার ভট্টাচার্যের গানের রেকর্ড সংগ্রহ করেছেন দেবদীপ সাহা ও জয়তী গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁদেরকে সংস্কার ভারতীর পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক দিয়ে সম্বর্ধনা জানান ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রেস ক্লাবের হলে তিলধারণের জায়গা ছিল না। যা প্রয়াত শিল্পীর জনপ্রিয়তাকেই আবারও প্রমাণিত করে।

অনুষ্ঠান মঞ্চে ভিক্টর ব্যানার্জী, (বাঁ দিক থেকে) বিমান বিহারী মুখোপাধ্যায়, দীপালী নাগ, বিভাস চক্রবর্তী ও বিকাশ ভট্টাচার্য।

জাতীয়তাবাদী সংবাদ সাপ্তাহিক
স্বস্তিকা
পড়ুন ও পড়ান
বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ঃ ২০০.০০
প্রতি সংখ্যার মূল্য ঃ ২.০০

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫, e-mail : vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com